৭

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে পাক হানাদার বাহিনীর আকস্মিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, সেনা ইউনিটগুলোতে নিরস্ত্রীকরণ ও নিধন, বুদ্ধিজীবী, ইপিআর, পুলিশ এবং নিরস্ত্র জনগণকে অবাধে হত্যার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে সময় লাগেনি। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী, ও হাজার হাজার তরুণ যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে । তবে দেশের সর্বত্র সশস্ত্র ইউনিট যেমন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীও রুখে দাঁড়ায়। যেসব স্থানে এসব সশস্ত্র ইউনিট অবস্থান করছিল সে স্থানে ব্যাপক ও প্রবল প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে তা বিজয় অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। সামরিক, আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও আপামর জনতা রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনে একতাবদ্ধ হয়, গড়ে তোলেন মুক্তিবাহিনী। প্রাথমিকভাবে এই প্রতিরোধ ছিল অসংগঠিত, উপস্থিত স্থানীয় নেতৃত্ব নির্ভর, আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত প্রবল শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে অসম লড়াই। তাই নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সমন্বয়ে যুদ্ধকে পরিকল্পিত রূপ দেয়ার জন্য গঠিত হয় সেক্টর ও ব্রিগেড ট্রুপস। এ ছাড়া স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী। এসব সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাক হানাদারদের পরাজিত করে। ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। বন্দুক শক্তির পরাজয় এবং জনতার বিজয় হয়। এভাবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত বেসামরিক জনতা ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রতিরোধ যুদ্ধ সফলতা লাভ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মর্যাদা পায়।

এ ইউনিট পাঠ করে আপনি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধ থেকে রণাঙ্গনে এবং চূড়ান্তভাবে বাঙালির বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. সশস্ত্র গণপ্রতিরোধ
- পাঠ-২. সৈনিক ও পুলিশের প্রতিরোধ
- পাঠ-৩. বাংলাদেশকে ১১ সেক্টর বিভক্তিকরণ
- পাঠ-৪. নিয়মিত, অনিয়মিত বিভিন্ন সশস্ত্রবাহিনী
- পাঠ-৫. উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গন
- পাঠ-৬. বীর শ্রেষ্ঠ
- পাঠ-৭. মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড
- পাঠ-৮. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন ও বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়

পাঠ-১

সশস্ত্র গণপ্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র গণপ্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিত ও প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *মুক্তিযুদ্ধকালীন ৪টি প্রশাসনিক বিভাগের গণপ্রতিরোধের প্রস্তুতি ও বিস্তার আলোচনা করতে পারবেন।*

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। পৃথিবীর খুব বেশি দেশ মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে জন্মলাভের গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র ও তরুণসহ আপামর জনগণের অংশগ্রণের মাধ্যমে এ যুদ্ধ সাফল্য লাভ করে। যদিও প্রাথমিকভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ প্রতিরোধ করে। প্রাথমিক এই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষুদ্র খন্ড প্রতিরোধই ক্রমান্বয়ে একটি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আকার ও রূপ নেয়। কোথাও এ প্রতিরোধ হয়েছে ছাত্র, তরুণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কৃষক ও শ্রমিকের মাধ্যমে। বিদ্রোহী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এতে যোগ দিয়ে প্রতিরোধকে শক্তিশালী করেন। আবার কোথাও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরোধে জনতা অংশ নেয়। তবে সামরিক ও বেসামরিক প্রতিরোধ পরবর্তীকালে পরিকল্পিত যুদ্ধের ভিত রচনা করে।

ক. গণপ্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিত বা প্রস্তুতি

১. স্বায়ত্তশাসন দাবি একদফা দাবি স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তর: পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণের ফলে বঞ্চিত বাঙালি জাতির প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই তাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল। ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ পশ্চিমা শোষকদের বিরুদ্ধে গণ রায় দিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় বাঙালির রায়কে নস্যাৎ করা হয়। অন্যদিকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও তাকে সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। ষাটের দশকে বিশেষ করে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণার পর থেকে যে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সূচনা হয় তা ১৯৭১ সালে এসে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে। আওয়ামী লীগ ও রাজনীতিকরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে গেলেও জনগণের বড় অংশ বিশেষ করে ছাত্র ও তরুণ সমাজ ছিল জঙ্গী এবং সশস্ত্র প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতার পক্ষপাতি। মূলত ছাত্রলীগের নেতৃত্বে

গড়ে ওঠা নিউক্লিয়াস ষাটের দশকের আন্দোলনে ব্যাপক গতি সঞ্চার করে। এরাই 'জয়বাংলা শে-াগান', ১৯৭০ সালে জাতীয় পতাকা তৈরি করে বাঙালিদের একটি স্বাধীন জাতির মর্যাদা প্রদানের প্রস্তুতি নেয়। বস্তুত স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করার প্রয়োজনে নিউক্লিয়াস জন্ম। ক্রমান্বয়ে এটি বিকশিত হয় এবং চূড়ান্তপর্বে মুক্তিযুদ্ধকালে 'বি এল এফ' নাম নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়।

২. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা: রাজনীতিবিদরা আশান্বিত ছিলেন নির্বাচনের রায় মেনে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এবং তাদের মতে, কোনরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টি শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার একটি অজুহাত সৃষ্টি করবে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে তাদের এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাঙালি এই প্রথম স্বশাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে এমনি স্বপ্নে জাতি উদ্বেলিত থাকলেও ১ মার্চ আকস্মিক প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়। আওয়ামী লীগ তাৎক্ষণিক এর প্রতিবাদ জানায় এবং ঐদিন থেকেই শুরু হয় জনগণের প্রতিরোধের প্রস্তুতি। ঢাকার রাজপথ মিছিলে-শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ কয়েক শ' খন্ড মিছিল সহকারে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। রাজপথে, গলিতে মিছিলকারী এসব মানুষের হাতে ছিল বাঁশের লাঠি, গজারি গাছের ডাল, কাঠের টুকরো ও লোহার রড। অধিবেশন স্থগিত করা সংক্রান্ত ঘোষণার সঙ্গে সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত, কলকারখানা, দোকানপাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সিনেমা হল ও সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গোটা শহর স্বত:স্ফূর্ত মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। এসময় ঢাকা স্টেডিয়ামে বিসিসিপি ও আন্তর্জাতিক একাদশের মধ্যে অনুষ্ঠানরত ক্রিকেট ম্যাচ ভন্ডুল হয়ে যায়। দর্শকরা স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে মিছিলে অংশ নেয়। মিছিলগুলো আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের কাছে থেকে নির্দেশ লাভের আশায় মতিঝিলস্থ হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক চলছিল। এই বৈঠকে পরের দিন ঢাকা শহরে এবং ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতাল ও ৭ মার্চ রেসকোর্সে জনসভার ঘোষণা দেয়া হয়। শেখ মুজিব উপস্থিত জনতা ও দেশবাসীকে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক দল এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোক যোগ দেয় এবং সেটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ছাত্রলীগ পরের দিন কর্মসূচি ঘোষণা দেয়। জনতার বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সত্ত্বেও অগণতান্ত্রিকভাবে ১ মার্চ রাতেই লে. জেনারেল ইয়াকুব খানকে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

পরের দিন ২ মার্চ আওয়ামী লীগের আহ্বানে ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। দল, মত, পেশা ভুলে গিয়ে শেখ মুজিবের ডাকে সমগ্র ঢাকা এক ও অভিন্ন হয়ে গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকারের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে। সরকারের ঘোষিত কারফিউ ভঙ্গ করে গভীর রাত পর্যন্ত মিছিল, বিক্ষোভ চলে। পুলিশের গুলিতে অনেকে বুলেট বিদ্ধ হয়। খন্ড খন্ড সংঘর্ষ হয় বিভিন্ন জায়গায়। শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত হরতাল পালনের আহ্বান জানান। ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সভা শেষে একটি নতুন পতাকা উত্তোলন করে এবং সেই পতাকার মর্যাদা রক্ষার শপথ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এটিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে কোন জায়গায় প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন। ৬ মার্চ একটানা সর্বাত্বক হরতাল ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রংপুর সহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ আন্দোলন চলে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলার বিক্ষুব্ধ নারী সমাজ বাঁশের লাঠি, লোহার রড ও কালো পতাকা নিয়ে সমাবেশ ও মিছিল বের করে।

৩. সাত মার্চে শেখ মুজিবের ঘোষণা ও সশস্ত্র প্রস্তুতির নির্দেশঃ ৭ মার্চ রেসকোর্সে ময়দানে দশ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব তাঁর বক্তৃতায় বাঙালির প্রতি পাকিস্তানি শাসক ও পাকবাহিনীর অত্যাচার, বৈষম্য তুলে ধরেন, নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ও ১ মার্চ থেকে পাকবাহিনীর নিরীহ বাঙালির ওপর গুলিবর্ষণ পরিস্থিতি তুলে ধরে ক্ষমতা হস্তান্তর নতুবা স্বাধীনতা ডাক দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতার শেষ অংশে বলেন, "প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থেকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাআল্লাহ্‌। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।"

৪. সাত মার্চ পরবর্তী পরিস্থিতি এবং স্বাধীনতার প্রস্তুতি শুরুঃ শেখ মুজিবের 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' ঘোষণার প্রেক্ষিতে সর্বাত্মক হরতাল পালনের পাশাপাশি সর্বত্র কাল পতাকা উত্তোলন, মিছিল, সমাবেশ শুরু হয়। আওয়ামী লীগ ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দেয়। ৭ মার্চ থেকেই আওয়ামী লীগের নির্দেশে দেশ চলতে থাকে। ঢাকা সফর শেষে করাচিতে গণঐক্য আন্দোলনের নেতা এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান বলেন, "শেখ মুজিব কার্যত ঢাকার সরকার, সেখানে সব সরকারি কর্মচারী ও সচিবরা তাঁর নির্দেশ পালন করছে। ঢাকায় কেবল সামরিক সদর দপ্তরে পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে।"

ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করে। ২০ মার্চ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) কুচকাওয়াজে ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী রাইফেলের কলাকৌশল প্রদর্শন করে। ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবসের' বদলে বাংলাদেশ দিবস পালিত করে। প্রেসিডেন্ট ভবন ও সেনা সদর ছাড়া কোথাও পাকিস্তানি পতাকা ওড়েনি, ওড়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা। ২৪ মার্চ এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাকিস্তানি বাহিনীকে সম্ভাব্য প্রতিরোধ করতে সশস্ত্র গণবিপ্লবকে আরো জোরদার করার আহ্বান জানান।

অন্যদিকে ঢাকার বাইরে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতায় ঘোষিত ঘরে ঘরে দূর্গ গড়া ও সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহ্বানে সারা দিয়ে বিভিন্ন জেলা, থানা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রস্তুতি চলতে থাকে। গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ, শুরু হয় সামরিক প্রশিক্ষণ।

৫. সংগ্রাম পরিষদ, সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ও পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ (২৫ মার্চ পর্যন্ত)

ঢাকা বিভাগঃ ঢাকার বাইরে জয়দেবপুরে প্রথম সশস্ত্র গণপ্রতিরোধের সূচনা হয়। ৭ মার্চের পর এখানে মো. হাবিবুল্লাহ, আ.ক.ম. মোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে জনতার সশস্ত্র প্রতিরোধ শুধু গাজীপুরে নয় সারা দেশের সার্বিক স্বাধীনতার সংগ্রামে তাৎপর্যপূর্ণ। ২৫ মার্চ পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের আগেই জয়দেবপুরবাসী গর্জে ওঠে। ঐদিন বিগ্রেডিয়ার জাহানজেবের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি দল ঢাকা থেকে জয়দেবপুরে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের অস্ত্র জমা নেওয়ার জন্য এলে পথে হাজার হাজার লোক দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড দেয়। জয়দেবপুর রেলক্রসিং-এর কাছে লাঠি, তীর, বন্দুক ছাড়াও অনেকে ব্যক্তিগত কয়েকটি বন্দুক নিয়ে উপস্থিত হয়। সেদিন জনতার অনুরোধে ৫ জন বাঙালী সৈনিক পাঞ্জাবি সৈনিকদের ওপর প্রথম গুলি ছুঁড়ে। পাল্টা গুলিতে নিহত হয় জয়দেবপুর বাজারে মনুমিয়া নামের এক দর্জি ও নিয়ামত নামে এক কিশোর

আহত হয়। কানু মিয়া নামে আর একজন নিহত হয়। মারমুখী জনতার প্রতিরোধ মোকাবেলা করে সে যাত্রা পাক সেনারা ঢাকা ফিরে যায়। কিন্তু জয়দেবপুরের প্রতিরোধের শিক্ষা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় শ্লোগান ওঠে 'জয়দেবপুরের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' এই ঘটনার পর জয়দেবপুরে অবস্থিত বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের সাথে আওয়ামী লীগের নেতাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে তাই মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে বাঙালি সৈনিকরা জয়দেবপুর থেকে বেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ১৯ মার্চের ঘটনার পর ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে জয়দেবপুর বনে গোপনে অস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সে যাত্রা ২০/২৫ জন ছাত্র এতে অংশ নেয়।

মানিকগঞ্জে ৮ মার্চ থেকে ইউওটিসির ডামি রাইফেল দিয়ে ছাত্র-জনতার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২৫ মার্চ রাতে ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরীকে প্রধান করে বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয়। ঐ রাতেই মানিকগঞ্জ ট্রেজারি থেকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। টাঙ্গাইলে বদিউজ্জামান খানকে সভাপতি করে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া ছাত্রলীগ সভাপতি এনায়েত করিমকে সভাপতি এবং আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে সাধারণ সম্পাদক করে 'জয় বাংলা বাহিনী' গঠিত হয়। এখানে মধ্য মার্চ থেকে ১০০ তরুণকে ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মোহাম্মদ আলী কলেজ, বিন্দুবাসিনী কলেজ, শিবলাল স্কুল ও আনসার ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। শেরপুরে আনিসুর রহমান, নিজাম উদ্দিন, রবি নিয়োগীকে নিয়ে গঠিত হয় সংগ্রাম কমিটি। বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র যুবক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিলে এদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিশোরগঞ্জে ১০ মার্চের পর ইসলামিয়া ছাত্রাবাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যক্তিগত অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। আত্মরক্ষার জন্য হাবিবুল্লাহ ও আতিকের (শহীদ) নেতৃত্বে প্রথম পেট্রোল বোমা তৈরি করা হয়। মাদারীপুরে ৮ মার্চ মৌলভী আসমত আলীকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১০ মার্চ গঠন করে 'জয় বাংলা' বাহিনী। এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং ২৩ মার্চ তীর ধনুক, লাঠি ও হালকা অস্ত্র সহ জয় বাংলা বাহিনীর র‍্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে।

চট্টগ্রাম বিভাগ: চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রামে ৭ মার্চের বক্তৃতার পর বেশ প্রস্তুতি চলে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, কাকলী, পান্নাপাড়া, সিটি কলেজ, এমইএস কলেজ, হালিশহর, জামাল লেন রোড, আগ্রাবাদ কলোনীতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। আন্দরকিল্লার বন্দুকের দোকান, চট্টগ্রাম কলেজের ইউওটিটি ভবন, রাইফেল ক্লাবের অস্ত্র লুট করে সংগ্রহ করা হয়। এম. আর. সিদ্দিকী, জহুর আহম্মদ চৌধুরীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে জেলা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া গঠিত হয় আবু মোহাম্মদ হাশেমের সভাপতিত্বে স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এভাবে ২৫ মার্চের আগেই সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ও ছাত্রদের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ফেণীতে খাজা আহমেদের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সীমিত আকারে প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

রাজশাহী বিভাগ: রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী ও রংপুরে প্রথম থেকেই প্রস্তুতি জোরদার ছিল। রংপুরে ৩ মার্চ দরদী সিনেমা হলের সামনে উর্দুতে লেখা একটি সাইনবোর্ড নামাতে গেলে শঙ্কু সমাদার নামে এক ব্যক্তি জনৈক বিহারির গুলিতে নিহত হন। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ মকবুল ১ মাস পর মারা যায়। তাঁরা রংপুরে প্রতিরোধের প্রথম শহীদ। ২৫ মার্চ কয়েকটি হেলিকপ্টারে করে রংপুরে বিপুল সংখ্যক পাক সৈনিক আসে। ঐ রাতেই পাকবাহিনী বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেয়। নাটোরে ১৪ মার্চ জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে ফেলে দেশের নতুন পতাকা তোলা হয়। ২৫ মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। নিচা বাজার চাখানার দোতলায় কন্ট্রোল রুম প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাবনায় ৭ মার্চের পর আওয়ামী লীগ

নেতা আমজাদ হোসেন এমএনএ-কে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট 'সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। পাবনার জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের খান ও পুলিশ সুপার আবদুল গাফফার এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কমিটির শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১২ মার্চ থেকে পাবনা জেলা স্কুল ও পুরানো পলিটেকনিকে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। অস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরি ও ব্যবহার শিক্ষা দেয়া হয়। ২৫ মার্চ সামরিক বাহিনী পুলিশকে অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দিলেও জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

খুলনা বিভাগ: যশোরে ৩ মার্চ কালেক্টরেটের সামনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে যশোরবাসী স্বাধীনতার শপথ নেয়। ঐ দিন পুলিশের গুলিতে মিছিলের অগ্রভাগের চারুবালা ধর শহীদ হন। এরপর থেকে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে যার নেতৃত্বে ছিল সংগ্রাম পরিষদ। ২৫ মার্চের আগেই এখানে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। কুষ্টিয়া ৭ মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। ২৫ মার্চ রাতে যশোর সেনানিবাস থেকে কুষ্টিয়া এসে উপস্থিত হয় পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক সৈন্য। সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে সেদিন রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেয় জনতা। কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন অফিসের সামনে একটি একতলা ভবন থেকে রংপুর ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী রনী রহমান পাক সেনাদের গাড়ির ওপর হাতবোমা নিক্ষেপের সময় পাক সেনাদের গুলিতে প্রাণ হারায়। তিনি কুষ্টিয়ায় সম্মুখ প্রতিরোধে প্রথম শহীদ। ঐদিন পাক সেনাদের গুলিতে ৭জন মারা যায়। অন্যদিকে বৃহত্তর কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গায় ছাত্র-জনতা পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে প্রথম থেকে প্রতিরোধে অংশ নেন। চুয়াডাঙ্গায় অবস্থানকারী ইপিআর-এর ৮৫০ জনের মধ্যে ৭০০ জনই বাঙালি হওয়ায় সকলে প্রতিরোধে অংশ নেন। সাতক্ষীরায়ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে মার্চে মাসের শুরু থেকে। ৩ মার্চ বিক্ষোভ মিছিলে গুলিবর্ষণ করলে রাজ্জাক নামে একজন কর্মী শহীদ হন। ৭ মার্চের পর এখানে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় মোস্তাফিজুর রহমানকে সভাপতি করে। ২৩ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভবনে পাকিস্তানি পতাকা ওড়ানো হয়। ২৫ মার্চ সাতক্ষীরার এম.এন.এ. আবদুল গফুরকে আহ্বায়ক করে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ঝালকাঠিতে শেখ মুজিবের ভাষণের পর পরই সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২৩ মার্চ ঝালকাঠিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এখানে আওয়ামী লীগের এম.এন.এ. নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এভাবে ২৫ মার্চের আগেই দেশের বিভিন্ন মহকুমা শহর, থানা এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে প্রতিরোধ প্রস্তুতি চলে। কোথাও কোথাও পাকবাহিনীর মোকাবেলা করে জনতা, দেশ এগিয়ে যেতে তাকে একটি সর্বাত্মক জনযুদ্ধের দিকে।

খ. গণপ্রতিরোধের প্রকৃতি ও বিস্তার

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কিংবা এর অব্যবহিত পর বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ চালালে শুরু হয় সর্বাত্মক প্রতিরোধ। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন মাত্রা যতো বেড়ে যায়, প্রতিরোধ উত্তাপও ততো বাড়তে থাকে। প্রাথমিকভাবে বাঙালি লাঠিসোটা, স্থানীয় অস্ত্র এবং পাকবাহিনীর কাছ থেকে উদ্ধারকৃত থানা লুট ও ব্যক্তিগত অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ রচনা করে। ২৮ মার্চ নিউইয়র্ক টাইমস-এ সাংবাদিক সিডনি শ্যানবার্গ লিখেছেন, লাঠি-বর্শা ও সহস্তে নির্মিত রাইফেল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা বিমান, ট্যাংক ও ভারি কামানে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধ নানা জায়গায় নানারূপে হয় এবং এর নেতৃত্বে ছিল নানা শ্রেণীর ব্যক্তি। প্রতিরোধের এই পর্ব চলে মে মাস পর্যন্ত।

ঢাকা বিভাগ: ঢাকা বিভাগের ঢাকা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান লক্ষবস্তু। এখানে সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে ও সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে পাকবাহিনী নিরস্ত্র জনতা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইপিআর হেডকোয়ার্টারে বাঙালিদের হত্যা করে। এসব জায়গায় পাকবাহিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ফার্মগেটের কাছে ২৫ মার্চ পাকবাহিনী প্রতিরোধকারী বাঙালি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ট্যাংক, মর্টার ব্যবহার করে। ২৯ মার্চ তেজগাঁ রেল স্টেশনের কাছে সামনাসামনি লড়াইয়ে ১২৬ জন পাক সেনা হতাহত হয় এবং তাদের তিনটি গাড়ি ধ্বংস হয়। ৩১ মার্চ আসাদ গেটের কাছে প্রতিরোধ যুদ্ধে ৫ জন পাক সেনা নিহত হয়। ঢাকার এসব প্রতিরোধ ক্রমান্বয়ে বিভাগের অন্যত্র ছড়িয়ে গড়ে। জয়দেবপুরে ১৯ মার্চ থেকে যে প্রতিরোধের সূচনা হয় তা ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানকার দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা এতে অংশ নেন। ২৬ মার্চের মধ্যেই এখানে অবস্থানরত পাঞ্জাবি সৈনিকদের বন্দি করা হয়। ২৯ মার্চ পাকবাহিনী বিমান থেকে বোমা মেরে জয়দেবপুরের দিকে অগ্রসর হয়। জনতার প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায় এবং ঐদিন পাকবাহিনী জয়দেবপুর দখল করে নেয়।

২৬ মার্চ টাঙ্গাইলে যুদ্ধকে আরো সুসংগঠিত করতে গড়ে ওঠে 'স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ'। লতিফ সিদ্দিকীকে গণবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ নিযুক্ত করা হয়। এদিকে হাইকমান্ডের নির্দেশের অপেক্ষা না করে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একদল সাহসী তরুণ সার্কিট হাউস দখল করে নেয়। এখানে অবস্থানরত ১৫০ জন পাকিস্তানি সৈনিক তাদের সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করলে প্রতিরোধ শক্তিশালী হয়। এপ্রিলের ২ তারিখে পাক সেনাদের একটি বড় দল দেড়শ' গাড়ি নিয়ে টাঙ্গাইলের দিকে আসার সময় প্রতিরোধ বাহিনী আক্রমণ চালালে প্রায় ৩০০ পাক সেনা নিহত হয় এবং ২৫টি গাড়ি ধ্বংস হয়। কাদেরিয়া বাহিনী প্রায় ১৭ হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও ৭১ হাজার সেচ্ছাসেবক নিয়ে জেলার বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করে। ময়মনসিংহে স্থানীয় যুবকরা ২৭ মার্চ ইপিআর ক্যাম্পের ম্যাগজিন রুমে ঢুকে অনেক অস্ত্র লুট করে একটি প্রতিরোধ দল গড়ে তোলে। পরের দিন পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রতিরোধকারী যোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। এ অস্ত্র দিয়ে শহরের অনেক জায়গায় ট্রেনিং শুরু হয়। ২২ এপ্রিল পাকবাহিনী ময়মনসিংহ দখলের আগে পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা ময়মনসিংহে কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিশোরগঞ্জে প্রতিরোধ প্রস্তুতি প্রথম থেকেই চলে। মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা ভৈরবের কাছে রামনগর ব্রিজ ভেঙ্গে দেয়া ছাড়াও কয়েকটি সড়ক ও রেল ব্রিজ উড়িয়ে দেয়। এপ্রিলের প্রথম দিকে মেজর হায়দারের নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধ ও ট্রেনিং শুরু হয়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গেরিলারা কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়কের গুরুত্বপূর্ণ তারাঘাট ব্রিজ ভৈরব-ময়মনসিংহ রেললাইনের মুসল্লি রেলসেতু উড়িয়ে দিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে। ১৯ এপ্রিল পাকবাহিনী কিশোরগঞ্জে প্রবেশ করলে ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ করে। পাকবাহিনীর কাছে টিকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে আশ্রয় নেয়।

ফরিদপুরেও সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ২৬ মার্চ থেকে এখানে একমাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু হয়। জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইমামউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ২২ এপ্রিলের আগে পর্যন্ত পাকিস্তানে বাহিনী ফরিদপুরে প্রবেশ করতে পারেনি। ২৫ মার্চ পাকবাহিনী কর্তৃক ঢাকায় গণহত্যার সংবাদ ফরিদপুরে পরদিন রাতে মাইকযোগে প্রচার করা হলে অসংখ্য লোক রাস্তায় বেড়িয়ে আসে। মাদারীপুরের তৎকালীন এসডিও সৈয়দ রেজাউল হায়াত ট্রেজারি থেকে রাইফেল বের করে দেন প্রশিক্ষণের জন্য। এজন্য সামরিক আদালতে তাঁর ১৪ বছরের জেল হয়। এসময় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চলতে থাকে পাকবাহিনীর মাদারীপুর প্রবেশের পথগুলোয় প্রতিবন্ধক গড়ে তোলার কাজ। সড়ক ও নৌপথে ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়। ২২ এপ্রিল হেলিকপ্টার থেকে পাকবাহিনী মাদারীপুরে গুলি চালায়।

২৪ এপ্রিল পাকবাহিনী মাদারীপুর শহর দখল করে নেয়। রাজবাড়ীর কর্তৃত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে থাকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত। ১৭ এপ্রিল পাকবাহিনী গোয়ালন্দ এসে পৌঁছুলে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বাধা দেয় । এছাড়া মেজর আবু ওসমানের নিয়ন্ত্রণাধীন এক প্লাটুন সৈন্যও প্রতিরোধে অংশ নেয়। রাত তিনটায় পাকবাহিনীর সঙ্গে যৌথ প্রতিরোধ বাহিনীর যুদ্ধ হয়। এসময় বিমান থেকেও পাকবাহিনী বোমাবর্ষণ করে। ফলে ঐদিনই পাকবাহিনী রাজবাড়ী প্রবেশ করে। গোপালগঞ্জের প্রতিরোধও ছিল শক্তিশালী। এখানে ২৮ মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি কামরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে মুক্তিযুদ্ধ সমন্বয় ও প্রতিরোধ কমিটি গড়ে ওঠে। ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জ শহর থেকে তিনমাইল দূর পোদ্দারের চরে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শুরু হয়। প্রতিটি থানায় এরপর প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এখানে এপ্রিলে হেমায়েত গড়ে তোলেন বিশাল গেরিলা বাহিনী। ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত পাকবাহিনী গোপালগঞ্জে আসতে পারেনি । ২৫ এপ্রিল গোপালগঞ্জ তারা দখল করে নেয়।

চট্টগ্রাম বিভাগঃ ২৬-২৯ মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে। বেতারকেন্দ্র স্থাপন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ পর্ব এসময় সম্পন্ন হয়। মার্চের প্রথম থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। ২৭ মার্চ বন্দরে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসকে কেন্দ্র করে জনতা, শ্রমিকদের সঙ্গে পাক হানাদারদের সংঘর্ষ হয়। এরপর ইপিআর ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সহ বাঙালি পুলিশের সঙ্গে বহু সংঘর্ষ হয়। তবে অস্ত্র, যানবাহন ও নেতৃত্বের অভাবে ২৯ মার্চের পর প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। এপ্রিলের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম শহর পাকবাহিনীর দখলে চলে যায়। যদিও দখলকালেও তারা মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এপ্রিলের প্রথম থেকেই মৌলভী সৈয়দ আহম্মেদের নেতৃত্ব পাহাড়তলী, সরাইপাড়া, ট্যাংক রোডসহ বিভিন্ন স্থানে চালানো হয় বিক্ষিপ্ত গেরিলা অপারেশন। শহর সংলগ্ন গ্রামগুলো গেরিলাদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। মে মাসের মাঝামাঝি শহরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা চলে আসেন এবং বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধে অংশ নেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের সিলেট ও মৌলভীবাজারেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী ছিল। ২৭ মার্চ মৌলভীবাজারে পাঞ্জাবি সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় তারা মিয়া ও জমির মিয়া, মনু নদীর ব্রিজের সামনের অন্য এক প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হন লুন্দুর মিয়া। মৌলভীবাজারের শমসেরনগরে ভাঙ্গা ট্রেনের ওয়াগন দিয়ে রেললাইনে ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়। জনতা ও বাঙালি ইপিআর যৌথ প্রতিরোধে একজন পাক মেজর সহ কয়েকজন নিহত হয়। এ ঘটনার পর পাকবাহিনী পিছু হটে শেরপুরে ঘাঁটি স্থাপন করে। শমসেরনগরে বহু অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা পায়। এরপর ২৫ দিন মৌলভীবাজার হানাদার মুক্ত থাকে। ফেনী কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হওয়ায় পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী উভয় পক্ষ এর দখল রাখতে সচেষ্ট ছিল। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পুলিশ, আনসার ও ছাত্র-জনতা মিলে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে। এসময় পাকবাহিনী ফেণী প্রবেশ করে। সে যাত্রা পাকবাহিনী হটে যেতে বাধ্য হয়। ৪ এপ্রিল পাকবাহিনীর বিমান হামলায় অবশ্য মুক্তিবাহিনী পিছু হটে যায়। যদিও ২২ এপ্রিল পর্যন্ত ফেণী শহর মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল।

রাজশাহী বিভাগঃ ২৫ মার্চ থেকেই রাজশাহী শহরে পাকবাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়। ৭ মার্চের বক্তৃতার পূর্ব থেকে ছাত্রলীগ ও সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় প্রশিক্ষণ নেয়। রাজশাহী কলেজ ল্যাবরেটরী লুট করে বোমা তৈরির রসদ সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া পুলিশ লাইনের পালিয়ে আসা সদস্যরা কিছু অস্ত্র নিয়ে আসে। ২৮ মার্চ পুলিশ-জনতার সম্মিলিত বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যদিও পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৩ এপ্রিল পুনরায় মুক্তিবাহিনী রাজশাহী মুক্ত করে এবং ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। নাটোরে প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ছিল শক্তিশালী। ২৭ মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পুলিশ, আনসার সহ সর্বস্তরের জনগণের এক সমাবেশ মতিন পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাকবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নাটোরের মহকুমা প্রশাসক কামালউদ্দিন এতে যোগ দিলে মুক্তিযোদ্ধাদরে শক্তি বৃদ্ধি পায়। ২৮ মার্চ নাটোর রাজবাড়ির কামান দিয়ে রাজশাহী-নাটোর সড়কে ব্যারিকেড দেয়া হয়। ট্রেজারি ভেঙ্গে ২৫০ টি রাইফেল বের করে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এই প্রতিরোধ এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ট্রেজারির অস্ত্র দিয়ে ২ এপ্রিল থেকে ট্রেনিং শুরু হয়। ৭ দিনের ট্রেনিং নেন ৬০ জন যোদ্ধা। ১২ এপ্রিল নাটোর প্রবেশ করে পাকবাহিনী এবং শহরে অবস্থান নেয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের অবাঙালি ইপিআরের সঙ্গে ২৬ মার্চ মুক্তিবাহিনী ও বাঙালি ইপিআরদের সংঘর্ষ হয়। সম্মিলিতভাবে জনতা অবাঙালি ইপিআরদের বিতাড়িত করে। ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর দখলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর থাকলেও ঐদিন আবার পাকবাহিনী শহর দখল করে।

পাবনায় ২৫ মার্চ পাক সেনারা প্রবেশ করে বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। ২৬ মার্চ জেলা প্রশাসক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নির্দেশ দিলে বিভিন্ন স্তরের জনগণ পুলিশ লাইনে সমবেত হয়। এই সমাবেশে তিনি পুলিশ ও ইপিআর সদস্যদের হাতে পুলিশ লাইনের সব অস্ত্র তুলে দেন। পাক হানাদারদের কারফিউ ভঙ্গ করে ঐ অস্ত্র দিয়ে জনতা প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হয়। ২৭-২৮ মার্চ দু'দিন একটানা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চলে। যুদ্ধে পাবনা টেলিফোন অফিসে অবস্থানরত ২৭/২৮ জন পাক সেনা নিহত হয়। ২৮ মার্চ ডাকবাংলা, স্টেডিয়াম মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। ২৯ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ বিমান হামলা চালালেও ৯ এপ্রিলের আগে পাবনা দখল করতে পারে নি। নওগাঁ মহকুমায় ২৬ মার্চ মো. আবদুল জলিলকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১টি থানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সে সাথে মহকুমার প্রত্যেক সড়ক পথে প্রতিবন্ধকতা ও শত্রুদের প্রতিহত করতে পরিখা খনন করা হয়। পাকবাহিনী বার বার নওগাঁয় প্রবেশের চেষ্টা করলে জনতার প্রতিরোধের মুখে তারা ব্যর্থ হয়। ২২ এপ্রিল নওগাঁ দখলের আগে বেশ কয়েকটি খন্ড যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে জয়লাভ করে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সৈন্যদের বহু অস্ত্র সংগ্রহ করে। শুধুমাত্র ২৯ মার্চ আড়িয়াবাজার ক্যাম্প দখলের যুদ্ধে জয়লাভ করে মুক্তিবাহিনী একজন ক্যাপ্টেন সহ ১০ জন পাক সেনা হত্যা এবং ২৫/৩০ ট্রাক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে। এগুলো পরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রণাঙ্গনে ব্যবহৃত হয়।

খুলনা বিভাগঃ খুলনা বিভাগের যশোরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী ছিল। ২৬ মার্চ পাকবাহিনী যশোরে প্রবেশ করলেও প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। মুক্তিবাহিনীর সব দল সম্মিলিতভাবে ৩০ মার্চ যশোর সেনানিবাস ঘেরাও করে। এছাড়া একটি দল যাদবপুরে হানাদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। সেচ্ছাসেবকরা রাতারাতি জেলার রেললাইন উপড়ে ফেলে। ১ এপ্রিল স্বেচ্ছাসেবকরা এশিয়ান হাইওয়ে বরাবর সবকটি পুল ও রাস্তার ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু ৪ এপ্রিল পাকবাহিনী শহরে প্রবেশ করে এবং ৬ এপ্রিলের মধ্যে শহর তাদের দখলে চলে যায়। যদিও শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ৭ এপ্রিল বেনাপোল সড়ক, ১৪ এপ্রিল কাগজপুকুরিয়ায় ইপিআর ও জনতার সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে পাকবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। কুষ্টিয়ায় পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর প্রথম সংঘর্ষ হয় ২৭ এপ্রিল। ১ এপ্রিল কুষ্টিয়া হানাদার মুক্ত হয়। এরপর ১৬ এপ্রিল পাকবাহিনী কুষ্টিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। মে মাসে কয়েকটি যুদ্ধ হয় পাকবাহিনীর সঙ্গে। ২৬ মার্চের মধ্যে চুয়াডাঙ্গায় মুজাহিদ, পুলিশ ও বাঙালি সৈন্য ও তরুণ যুবকদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। ২৭ মার্চ রেল লাইন তুলে ফেলা হয়। পাশাপাশি ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কপথে অবরোধ সৃষ্টি করে। এই বাহিনীও কুষ্টিয়ার বাহিনীসহ মোট ৭০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও ৪০০ মুজাহিদ ৩০ মার্চ কুষ্টিয়া আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ২০০ জন পাক সেনা নিহত হয়। ৩১ মার্চ দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে কুষ্টিয়া প্রথম শত্রুমুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। ৩ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গার ওপর

পাকবাহিনীর বিমান হামলা শুরু হয়। যদিও ১৫ এপ্রিলের আগে তারা চুয়াডাঙ্গা দখল করতে পারে নি। ১৬ এপ্রিল পাকবাহিনী চুয়াডাঙ্গা প্রবেশ করে।

সাতক্ষীরায় ৭ মার্চের বক্তৃতার পর যে প্রস্তুতি শুরু হয় তা পূর্ণতা লাভ করে ২৭ মার্চ। ঐদিন খুলনার পুলিশ সুপার এ.কে. খন্দকার সাতক্ষীরা মহকুমা পুলিশ অফিসারকে ট্রেজারি থেকে ৩৫০ টি রাইফেল, ৩০/৪০ বাক্স গুলি প্রদানের নির্দেশ দেন। ছাত্রদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ট্রেনিং। মে মাস পর্যন্ত সাতক্ষীরার বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিবাহিনীর প্রাধান্য ছিল। ২৯ এপ্রিল ভোমরার যুদ্ধে প্রায় ২০০ পাক সেনা নিহত হয়। ঝালকাঠি ও বরিশালে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ছিল শক্তিশালী। ২৫ এপ্রিলের আগে বরিশালে ও ঝালকাঠি পাকবাহিনীর দখলে যায়নি। ২৭ মার্চ এনায়েত হোসেন এমএনএ-কে সিভিল চিফ ও লে. জিয়াউদ্দিনকে প্রতিরক্ষা প্রধান করে পিরোজপুর সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ন্যাপ (মোজাফফর), আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে পৃথক ট্রেনিং সেন্টার গড়ে ওঠে। ৪ মের আগে পিরোজপুরে পাকবাহিনী প্রবেশ করতে পারেনি। এপ্রিল ও মে মাসে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের শিকার বাঙালিরা শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ এবং পরবর্তী নির্দেশানুযায়ী হাতের কাছে যা ছিল তা দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলা করে। এসময় অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাঙালি ইপিআর, সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং ছাত্র-জনতা। সাধারণ মানুষ তাদের রসদ যুগিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, পথ দেখিয়ে সাহায্য করে, কেউ কেউ সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়। এভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ যুদ্ধ এগিয়ে যায়। প্রতিরোধের এই লড়াই চলে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত। প্রথম দিকে তা কোথাও ছিল অপরিকল্পিত, কোথাও পরিকল্পিত। মে মাসে পরিকল্পিত ও সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধ শুরু হয়। পর্যুদস্ত হতে থাকে পাকিস্তানি বাহিনী। সংগ্রামী বাঙালি জাতির জয় হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ", সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬।

২। মাহমুদ হাসান, *দিনপঞ্জি : একাত্তর*, ঢাকা, পাইওনিয়ার, ১৯৯১।

৩। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।

৪। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ২য় খন্ড, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯।

৫। আতিউর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের পতাকা ১৯৭১ সালে প্রথম উত্তোলিত হয়-

(ক) শেখ মুজিবের বাসভবনে; (খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে;

(গ) পল্টন ময়দানে; (ঘ) চট্টগ্রামে

২। 'শেখ মুজিব ঢাকার সরকার', ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে এ মন্তব্য করেন -

(ক) জুলফিকার আলী ভুট্টো; (খ) খান বাহাদুর আবদুল কাইউম খান;

(গ) এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান; (ঘ) খান এ. সবুর খান।

৩। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯ মার্চ প্রথম জনতার সঙ্গে পাকবাহিনীর প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়-

(ক) তেজগাঁ; (খ) চট্টগ্রাম;

(গ) রাজশাহী; (ঘ) জয়দেবপুর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের বক্তৃতার পর থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকার বাইরে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি সংক্ষেপে লিখুন।

২। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগের সশস্ত্র প্রতিরোধ লিখুন।

৩। ২৬ মার্চ থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত রাজশাহী বিভাগের যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র গণপ্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিত ও প্রস্তুতি পর্যালোচনা করুন।

২। মুক্তিযুদ্ধকালে ৪টি প্রশাসনিক বিভাগের গণপ্রতিরোধের প্রকৃতি ও বিস্তার বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

সৈনিক ও পুলিশের প্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালি সামরিক বাহিনী ও পুলিশের সদস্যদের অবস্থান ও সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার সূচনা এবং সামরিক বাহিনীর প্রতিরোধ আলোচনা করতে পারবেন;*
- *পুলিশ বাহিনীর প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।*

পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে বাঙালি নিধনযজ্ঞে নামার সাথে সাথেই প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। পাকবাহিনীর মার খেয়ে পালিয়ে ঘরে না গিয়ে হাতের কাছে যা ছিল তাই নিয়ে ছাত্র, শ্রমিক, জনতা এবং সেনাবাহিনীর চাকরিরত বাঙালি সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অনেকে তাদের পাখি মারা বন্দুক দিয়ে, কেউ কেউ হাতের কাছের অস্ত্র দিয়ে, কেউ কেউ থানা বা ট্রেজারি থেকে অস্ত্র নিয়ে বের হয়। এ বিপুল সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনায় বলীয়ান হয়ে সামান্য রাইফেল, বন্দুক নিয়ে আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করে। বাংলাদেশের অনেক স্থানে এসব বাহিনীর সদস্যরা জনগণকে সাথে নিয়ে উল্টো পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণ করে তাদের পর্যুদস্ত করে। প্রতিরোধের এ লড়াই চলে ২৫ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের দিন পর্যন্ত। অবশ্য কোথাও কোথাও প্রতিরোধকারীরা এতোই শক্তিশালী ছিল যে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিজেদের এলাকা শত্রুমুক্ত রাখে। মুজিবনগর সরকার সেক্টর গঠনের পর প্রতিরোধ পর্যায়ের যুদ্ধের অবসান ঘটে, শুরু হয় পরিকল্পিত ও সংগঠিত যুদ্ধ।

ক. সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অবস্থান ও সংখ্যা

পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য নীতির ফলে সামরিক বাহিনীতে বাঙালি নিয়োগ ছিল খুব সামান্য। সামরিক বাহিনীর সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে মাত্র ৪% ছিলেন বাঙালি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে গঠিত হয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড। গোলন্দাজ বাহিনীর ব্রিগেড ছিল ঢাকা, যশোর, রংপুর, সৈয়দপুর সব মিলিয়ে বাঙালি সৈন্য ছিলেন মাত্র ৬,০০০ জন। সেনাবাহিনী ছাড়া তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর, বর্তমান বিডিআর)-এ প্রায় ১৫,০০০ বাঙালি সৈনিক নিযুক্ত ছিলেন। এদের বড় অংশ সীমান্ত এলাকায় অবস্থানের ফলে তাদের পক্ষে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া সহজ ছিল। পুলিশ বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে মোট পুলিশের সংখ্যা ছিল ৩৩,৯৯৫ জন। এর মধ্যে সশস্ত্র পুলিশ ২৩,৬০৬ জন এবং বাকিরা অস্ত্র সজ্জিত না হলেও

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিল। এসব পুলিশের অনেকেই প্রতিরোধ ও পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। অবশ্য স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে এদের অনেকে গণহত্যার শিকার হন।আনসার, মুজাহিদদের কয়েক হাজার, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, পুলিশ, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন, ছুটিতে আসা বাঙালি সৈনিকরা যুদ্ধে যোগ দেন। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে সমস্ত স্তরের জনগণের স্বত:স্ফূর্ত সমর্থনের ফলে সংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে।

খ. পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার সূচনা এবং সামরিক বাহিনীর প্রতিরোধ

পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সালের নির্বাচনের রায় অনুযায়ী আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন না করতে দেয়ার পরিকল্পনা হিসেবে অসহযোগ আন্দোলন দমনের নামে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ বিভিন্ন শহরে বাঙালি নিধনে মেতে ওঠে। ১৫ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের আড়ালে কালক্ষেপণ করে সৈন্য সমাবেশ করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র সম্ভার এনে গণহত্যার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত ও অনুমোদিত হয়। অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লাসহ সেনানিবাস, ইপিআর সদর দপ্তর পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ সব সেনা, ইপিআর ও পুলিশ অবস্থান ঢাকা, রাজশাহী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আক্রমণ চালানো হয়। যদিও মধ্যরাত থেকেই পাকিস্তানি অভিযান ও পুলিশের প্রতিরোধ সমানতালে চলতে থাকে।

ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর প্রতিরোধ

পিলখানা: সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ইপিআর-এর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এরা ছিল অগ্রণী। প্রাথমিক পর্যায়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদের বড় অংশও এদের মাধ্যমে এসেছে। ২৫ মার্চ ঢাকার পিলখানায় ২৫০০ ইপিআর সদস্য অবস্থান করছিলেন। ঢাকা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে আসা পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি দল পিলখানা আক্রমণ করে। বাঙালি সৈন্যরা প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে এবং পাকিস্তানি হানাদার ও বাঙালি ই.পি.আর সদস্যদের মধ্যে যুদ্ধ সারা রাত ধরে চলে। শত শত বাঙালি সৈন্য নিহত হন। ২৬ মার্চ ট্যাংক বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তায় পিলখানায় এলে বাঙালি সৈন্যরা অসম যুদ্ধে টিকতে না পেরে পিছু হটে যায়। পিলখানায় বাঙালি সৈন্যদের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বে এই প্রতিরোধ যুদ্ধে বীরত্ব বাঙালি জনগণকে অনুপ্রাণিত করে।

চট্টগ্রাম সেনানিবাস: ২৫ মার্চ রাত ১১টায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম সেনানিবাস আক্রমণ করে। প্রায় ১০০০ বাঙালি সৈন্যকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে। চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২৫০০ বাঙালি সৈন্য ছিল। বাঙালি সৈনিকরা মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ষোলশহরে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

চট্টগ্রাম ইপিআর সেক্টরের প্রতিরোধ: চট্টগ্রামের ইপিআর সেক্টরের এডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন রফিক ২৫ মার্চ রাতের প্রথম প্রহর থেকে বিদ্রোহ করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি ইপিআর সৈন্যদের নিরস্ত্র করেন। এরপর ২/৩ দিন তিনি চট্টগ্রাম শহর দখলে রাখেন। এসময় কুমিল্লা থেকে আরো পাকিস্তানি সৈন্য এনে সমাবেশ করা হয়। ২৬ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে চট্টগ্রামের কুমিরায় ইপিআর-এর যুদ্ধ হয়।এ অভিযানে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া নেতৃত্ব দেন। প্রায় ২০০ পাক সেনা নিহত হয়। ৩১ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী ইপিআর সেক্টর

আক্রমণ করে এবং ইপিআর বাহিনী প্রতিরোধ করলেও সংখ্যা ও শক্তির দিক থেকে দুর্বল হওয়ায় পিছু হটে যায়।

চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর এবং কাপ্তাই, রাঙামাটি থেকে ইপিআররা কালুরঘাটে সমবেত হয়। এখানে এই যৌথ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরক্ষা বূহ্য রচনা করেন। ২৯ মার্চ পাকবাহিনী এখানে আক্রমণ চালায়। ৩১ মার্চ আবারো আক্রমণ চালালে কয়েক দিন ধরে বাঙালিরা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সম্পূর্ণ মার্চ মাসে ইপিআর বাহিনী চট্টগ্রাম শহরে বিক্ষিপ্তভাবে পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এমনকি এপ্রিলের ৩-৬ তারিখেও যুদ্ধ হয়। ১১ এপ্রিল চূড়ান্তভাবে কালুরঘাটের পতন ঘটলে বাঙালি সৈনিকরা ভারতে আশ্রয় নেয়।

রাজশাহী: রাজশাহী শহর ছিল ইপিআর সেক্টর সদর দপ্তর। ২৬ মার্চ থেকে সেক্টর সদর দপ্তরের সকল বাঙালি বন্দি হয়ে যান। কেউ কেউ পালিয়ে বেসামরিক পোশাকে জনতার সঙ্গে মিশে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২৭ মার্চ সুসজ্জিত পাকবাহিনী রাজশাহী শহর দখল করে। ২৭ মার্চ রাজশাহীর বাঙালি ইপিআর সদস্যরা নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ইপিআরদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। অবশ্য রাজশাহীতে এপ্রিলের ৬ তারিখে ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। ৪ ঘন্টা স্থায়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটে উপশহরে সামরিক ছাউনিতে আশ্রয় নেয়। ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত রাজশাহী শহর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে থাকে। ১১ এপ্রিল থেকে আবার তুমুল যুদ্ধ হয় এবং ১৪ এপ্রিল পাকবাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমণে টিকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা চাঁপাইনবাবগঞ্জে সরে যান। রাজশাহী শহর পাকবাহিনীর দখলে চলে যায়।

নওগাঁ: ২৬ মার্চ নওগাঁর ইপিআর উইং-এর বাঙালি সৈন্যরা স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। ঐ রাতেই পাকিস্তানি বাহিনী উইং আক্রমণ করলে তাঁরা অস্ত্রাগার খুলে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এছাড়া ক্যাপ্টেন গিয়াস ও মেজর নাজমুল বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলে প্রতিরোধ শক্তিশালী হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: ২৭ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ইপিআর উইং-এর বাঙালি সৈন্যরা অবাঙালি ইপিআরদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এসময় বাঙালি ইপিআর সদস্যরা অস্ত্রাগার খুলে দিলে জনতা-ইপিআর যৌথভাবে আক্রমণ চালায়। অবশেষে অবাঙালি ইপিআর সদস্যরা আত্মসমর্পণ করে। যদিও এপ্রিলের শুরু থেকে আবার পাকবাহিনী শক্তি সঞ্চয় করে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। ১৭ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর বিমানের গুলিবর্ষণের কারণে ক্যাপ্টেন গিয়াস তাঁর বাহিনীসহ ভারতে আশ্রয় নেন। যদিও এতোদিনের প্রতিরোধ যুদ্ধে জয়ী হয়ে তাঁর বাহিনী ৩০০০ রাইফেল, স্টেনগান ও এল.এম.জি. লাভ করে যা ভারতে নিয়ে যান।

দিনাজপুর: দিনাজপুর ইপিআর বাহিনীর সেক্টর হেড কোয়ার্টার ছিল। আক্রমণের আশংকায় ২৮ মার্চ হাবিলদার আবু সাঈদ বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে অস্ত্র বিতরণ করে প্রস্তুত থাকেন। রাত তিনটায় পাকবাহিনী সেক্টর আক্রমণ করলে পাল্টা গুলিবর্ষণ করা হয়। ঐদিনের প্রতিরোধ যুদ্ধে বাঙালি ইপিআররা পাকিস্তানি দের পিছু হটিয়ে দেন। অবশ্য ৩১ মার্চ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ঐদিনই বাঙালি প্রতিরোধকারীদের হাতে দিনাজপুর শহরের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। পাকিস্তানি বাহিনীর সকলে সৈয়দপুর পালিয়ে যায়। মূলত আনসার, মুজাহিদ, ইপিআর, জনতার সহযোগিতায় এই সাফল্য বয়ে আসে। ১৬ এপ্রিল পাকবাহিনী দিনাজপুর দখলের আগে পর্যন্ত তা মুক্তিবাহিনীর দখলে ছিল।

ঠাকুরগাঁ: ২৮ মার্চ ইপিআর বাহিনীর ঠাকুরগাঁ উইং-এ বাঙালি ও অবাঙালি ইপিআর-এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং ২৯ মার্চ সারা দিন যুদ্ধ চলে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র-জনতা বাঙালি ইপিআরদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। বাঙালি ইপিআররা উইং-এর কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেন। ১০৪ জন পাকিস্তানি ইপিআর সহ মোট ১১৫ জন নিহত হয়। জীবিত অবাঙালি ইপিআরদের বন্দি করা হয়।

রংপুর: রংপুর ছিল ইপিআর বাহিনীর ১০ নম্বর উইং সদর দপ্তর। এছাড়া রংপুরে সেনানিবাসও ছিল। ২৫ মার্চ রাত ১২টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী রংপুরে বাঙালি ইপিআরদের ওপর আক্রমণ চালায়। ইপিআরদের আগেই নিরস্ত্র করায় তারা তেমন প্রতিরোধ করতে পারেননি। অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ২৯ মার্চ জয়মনিরহাটে পলায়নরত ৮ জন অবাঙালি ইপিআরের সঙ্গে বাঙালি ইপিআরদের সংঘর্ষে ৮ জনই নিহত হয়। ১ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলায় বাঙালি ইপিআর বাহিনী আরো সাফল্য লাভ করে। ঐদিন তিস্তা ব্রিজের যুদ্ধে একজন পাক মেজর সহ ১৫ জন পাক সেনা নিহত হয়। এরপর ৪, ৭ ও ৮ এপ্রিল পর্যন্ত কালিগঞ্জ থানা, লালমনিরহাটে বাঙালি ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে পাকবাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধ হয়।

কুষ্টিয়া: পঁচিশ মার্চ রাতেই যশোর সেনানিবাসের পাকবাহিনীদের একটি দল কুষ্টিয়া শহর দখল করে নেয়। বৃহত্তর কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা জেলায় ইপিআর উইং সদর দপ্তর থাকায় কুষ্টিয়ায় বাঙালি ইপিআররা তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। তবে চুয়াডাঙ্গায় মেজর আবু ওসমানের নেতৃত্বে ৬৫০ জন ইপিআর বাহিনী, পুলিশ, আনসার, স্থানীয় জনগণ ও নেতৃবৃন্দের সাহায্যে শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত থাকেন। ৩০ মার্চ চুয়াডাঙ্গার এই প্রতিরোধ বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঘাঁটি কুষ্টিয়া থানা পুলিশ লাইন ও জেলা স্কুল আক্রমণ করে। তিন দিক থেকে আক্রমণ ও জয় বাংলা শ্লোগানের ফলে পাক সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত সংখ্যা সর্ম্পকে বিভ্রান্ত হয়। পাক সেনারা সকলে পালিয়ে এসে জেলা স্কুলে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে স্কুল ঘিরে রাখে। পাক সেনারা অত্যাধুনিক অস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণের ফলে মুক্তিবাহিনী এগিয়ে আসতে পারেনি। শেষপর্যন্ত রাতে জীবিত ৪০/৫০ জন পাকসেনা ঝিনাইদহে পালিয়ে যায়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছু নেয়। অনেক নিহত ও বন্দি হয়। ৩১ মার্চ কুষ্টিয়া মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। কুষ্টিয়ার যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা হস্তগত করে। কুষ্টিয়া অভিযানের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন আযম। কুষ্টিয়ায় উদ্ধার করা অস্ত্র চুয়াডাঙ্গা উইং-এ নিয়ে যাওয়া হয়। ৩ এপ্রিল বিমান দিয়ে পাক সেনারা চুয়াডাঙ্গার ওপর বোমা নিক্ষেপ করে।

যশোর: ২৫ মার্চ রাতেই যশোর সেনানিবাসের পাক সেনারা যশোরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঘাঁটি স্থাপন করে। ঐ রাতেই পাক সেনারা যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ চালালে বাঙালি ইপিআর বাহিনী মোকাবেলা করে। ৩০ মার্চ যশোর সেনানিবাসের বাঙালি সৈনিকদের ওপর পাকবাহিনী আক্রমণ চালায়। এর আগেই অস্ত্রাগারের ভার অবাঙালিরা নিয়ে নেয়ায় বাঙালিরা তেমন প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। অনেক বাঙালি সৈনিক, অফিসারকে পরিবারের সদস্য সহ হত্যা করা হয়। যশোর শহরে ঐদিন বাঙালি ইপিআররা পাকবাহিনীর মোকাবেলা করে। ঐদিন রাতে যশোর শহরে পাকবাহিনীর গাড়ি বহরের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ইপিআররা ৫০ জন পাক সেনাকে হত্যা করে। বাকি সৈন্যরা যশোর সেনানিবাসে পলিয়ে যায়। ঐদিন যশোর শহর শত্রুমুক্ত হয় এবং পাক সেনারা সেনানিবাসে বন্দি হয়ে পড়ে। ২ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা সেনানিবাসের কাছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যদিও পাকবাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্রের কাছে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। এর মধ্যে ঢাকা থেকে অস্ত্র ও সৈন্য এনে সেনানিবাসে সমাবেশ ঘটানো হয় এবং ৬ এপ্রিল পাকবাহিনী যশোর শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এরপর প্রায় প্রতিদিন বিমান হামলা চলে। যদিও

মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। ১৩ এপ্রিল নড়াইল পাকবাহিনী দখল করে নেয়। তবে বেনাপোল-যশোর রোডের কর্তৃত্ব ছিল বাঙালি ইপিআর সদস্যদের দখলে।

সিলেট: সিলেট ছিল ইপিআর-এর সেক্টর সদর দপ্তর। এই সেক্টরের ১২নং উইং-এ অবস্থানরত বাঙালি ইপিআররা ২৯ মার্চ সকল অবাঙালি ইপিআরকে বন্দি করে। ২৭ মার্চ সুবেদার ফজলুর নেতৃত্বে ইপিআর বাহিনীর একটি দল শমসেরনগর বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করে। পাকবাহিনী পালিয়ে সিলেট চলে যায়। মৌলভীবাজারে ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে পাকবাহিনীর সংঘর্ষে ২১ জন পাকসেনা নিহত হয়। এছাড়া আখলিয়া, সুনামগঞ্জ, শালুটিকর-এ কয়েকটি যুদ্ধে বাঙালি ইপিআররা সাফল্য লাভ করে। ১ এপ্রিল মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত বিক্ষিপ্ত ইপিআরদের সংগঠিত করেন। শেরপুর ও শাদীপুরে তাঁর বাহিনী পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালালে অধিকাংশ পাক সেনা নিহত হয়। শাদীপুর মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয়। কুলাউড়া, শেওলা, গোলাপগঞ্জেও শক্তিশালী প্রতিরোধ মুক্তিযোদ্ধারা গড়ে তুলেন। ৭ এপ্রিল সিলেট বিমান বন্দর ও লাক্কাতুরা চা বাগান মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত পাকবাহিনী বিমানে করে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে বোমা ফেলে। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয়।

কুমিল্লা: কুমিল্লার বিভিন্ন উইং-এর বাঙালি ইপিআররা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ২৮ মার্চ বিদ্রোহী ইপিআর সদস্যরা কিছু সংখ্যক আনসার, পুলিশ ও ছাত্রজনতার সমন্বয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন। ২৯ মার্চ ইপিআরদের একটি দল আখাউড়া কোম্পানিতে পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। বহু পাক সেনা এখানে পালাতে গিয়ে মারা যায়। আখাউড়া মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। ২ এপ্রিল পাক সেনারা বিমান থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অবস্থানে বোমাবর্ষণ করে। ১৪ এপ্রিল পাকবাহিনী কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার পথে পাকবাহিনীর গাড়িবহরকে ইপিআর বাহিনী আক্রমণ করলে ১৭০ জন পাক সেনা নিহত হয়।

এভাবে দেখা যায় যে, ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তান বাহিনী আঘাত হানার পর ইপিআর বাহিনী যেমনভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিল তেমনিভাবে সারা বাংলাদেশে এমনকি থানা, ইউনিয়ন, গ্রামবাসী পর্যন্ত পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে। এভাবে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

গ. পুলিশ বাহিনীর প্রতিরোধ

১৯৭১ সালের প্রথম থেকেই পুলিশ বাহিনীর একটি বড় অংশ বাঙালি জাতির স্বাধীনতার প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংগ্রাম কমিটি ও স্থানীয় ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এ পর্যায়ে পুলিশ বাহিনী অনেক জায়গায় সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, ট্রেনিং ও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করে। কোন কোন স্থানে গোপন সমঝোতার মাধ্যমে সরবরাহকৃত পুলিশের অস্ত্র দিয়ে ট্রেনিং চালানো হয়। অন্যদিকে ট্রেনিং-এর সংবাদ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন রেখেও পুলিশ সহযোগিতা করে। বিভাগ, জেলা পর্যায়ে সামরিক জান্তার নির্দেশ অমান্য করে অস্ত্র জমা না দিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে পুলিশ বাহিনী প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়। পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে পুলিশের এই প্রস্তুতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ২৫-২৭ মার্চের মধ্যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, ময়মনসিং, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর সহ বিভিন্ন পুলিশ ব্যারাক, থানা ও উল্লেখযোগ্য পুলিশ

এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে বহু পুলিশকে হত্যা করে। পুলিশ বাহিনী এসব এলাকায় শুধু ৩০৩ রাইফেল সম্বল করে সুসজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করে এবং বহু পাকিস্তানি সৈন্যকে হতাহত করে। যদিও প্রাথমিক প্রতিরোধের সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। শুধু মনোবল সম্বল করে যুদ্ধে পুলিশ সে সময় বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। পুলিশ বাহিনী এরপর বিভিন্ন রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে ট্রেনিং প্রদান, রণাঙ্গনে এবং মুজিবনগর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডে পুলিশ বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এ বাহিনীর ১৫১ জন অফিসার বিভিন্ন সেক্টরে সরাসরি যুদ্ধ করেন।

রাজারবাগ পুলিশ লাইন: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গভীর রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাকবাহিনী গণহত্যা চালায়। গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে তারা সে রাতে প্রথমেই রাজারবাগ সহ বিভিন্ন জেলায় পুলিশ ব্যারাক ও পুলিশের লক্ষবস্তুতে আক্রমণ চালায়। রাত বারোটার মধ্যেই ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রথম আক্রমণ চালায়। পুলিশের প্রতিরোধের মুখে প্রথমে হামলাকারীরা সুবিধা না করতে পারলেও পরে ভারী অস্ত্র সহ আক্রমণ করলে অনেক পুলিশ শহীদ হন। প্রতিরোধ রচনা এবং আক্রমণে সে রাতে শহীদ হন ৩৯ জন বীর পুলিশ, আহত ও গ্রেফতার হন আরো অনেকে। রমনা থানায় ডিএসপি জিয়াউল হক লোদী তাঁর পুলিশ ফোর্স নিয়ে প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এ সংঘর্ষে কয়েকজন পুলিশ নিহত ও বন্দি হন। জিয়াউল হক লোদী স্বাধীনতার পরপর মিরপুরে বিহারিদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহীদ হন। পাকবাহিনী ২৫ মার্চ রাতেই শাখারিবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ চালিয়ে কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে। সে রাতেই পুলিশ মিরপুর ও বংশালে প্রতিরোধ রচনা করে। যদিও শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। সূত্রাপুর, ফরিদাবাদ সহ ঢাকার সকল পুলিশ ফাঁড়ি ও থানা ২৫ মার্চেই পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

দামপাড়া, চট্টগ্রাম: ঢাকার পরই সবচেয়ে বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয় চট্টগ্রামের দামপাড়া পুলিশ ব্যারাক। ২৫ মার্চ রাতেই পাকবাহিনী দামপাড়া পুলিশ ব্যারাকে আক্রমণ চালায়। চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত এই বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে বহু পুলিশ প্রাণ হারান। ২৯ মার্চ পর্যন্ত চলে পাকবাহিনীর তান্ডব। একদিনেই পাকবাহিনী পুলিশসহ ৮১ জনকে হত্যা করে। দামপাড়া ছাড়া চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের কাছে পাকবাহিনী বাধার সম্মুখীন হয়। চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং-এর সামনে কোতোয়ালী থানার তৎকালীন ওসি আবদুল খালেকের নেতৃত্বে পুলিশের সঙ্গে পাকবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। ওসি খালেক পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে জীপের পেছনে বেঁধে রাস্তায় ছেঁচড়িয়ে নিয়ে যায় এবং নির্যাতন শেষে হত্যা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার অপরাধে চট্টগ্রামের এসপি শামসুল হক এবং আরআই আকরাম খানকে পাকবাহিনী হত্যা করে।

ফেনী: ফেনীতেও পুলিশ বাহিনী প্রথম থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ২৯ মার্চ ফেনীতে পুলিশের প্রথম প্রতিরোধ সফল হয়। পুলিশ-জনতার যৌথ আক্রমণে সেদিন পাকবাহিনীর ৯ জন সদস্য মারা যায়। ফেনীর মহকুমা পুলিশ অফিসার মোহাম্মদ আলী ফেনীতে রক্ষিত পুলিশের যাবতীয় অস্ত্র স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। ফেনী ত্যাগের আগে প্রায় ১০০ জন পুলিশ ক্যাপ্টেন রবের অধীনে প্রশিক্ষণ নেন এবং পরে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন।

কুমিল্লা: ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী কুমিল্লা পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে। এবং পুলিশ প্রতিরোধ রচনা করে। কিন্তু কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে আগত সুসজ্জিত বাহিনীর কাছে পুলিশ পর্যুদস্ত হয়। সেদিন অনেক

পুলিশ শহীদ হন। কুমিল্লার এসপি কবির উদ্দিন আহমদকে পুলিশের প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

রাজশাহী: রাজশাহী সারদা একাডেমী ও পুলিশ লাইনের পুলিশরা প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। রাজশাহীতে ২৬ মার্চ পুলিশ জনতার সাথে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। সেইদিনই সন্ধ্যায় পাক সৈন্যদের কয়েকটি গাড়ি পুলিশ লাইনের কাছে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। পুলিশ বাহিনী পাল্টা গুলি ছুঁড়লে পাকবাহিনী ঐ রাতে আর অগ্রসর না হয়ে সামরিক ছাউনিতে ফিরে যায়। প্রকৃতপক্ষে তারা পুলিশের শক্তি সম্পর্কে আঁচ করার জন্যেই এ আক্রমণ চালায়। ২৭ মার্চ সকালে পাকিস্তানি সৈন্যরা মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাজশাহী শহর টহল দেয় এবং দুপুরে পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। পুলিশ বাহিনী জেলা পুলিশ সুপার এম.এ. মজিদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ করে। তিন ঘন্টা স্থায়ী যুদ্ধে পুলিশ টিকতে না পেরে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিনই পুলিশ লাইন পাক সেনারা দখল করে নেয়। ৩১ মার্চ পাকবাহিনী এসপি মজিদকে ধরে নিয়ে যায় এবং পরে হত্যা করে। রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মামুন মাহমুদও মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে শহীদ হন।

পাবনা ও বগুড়া: রাজশাহী বিভাগের পাবনা ও বগুড়ায় পুলিশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পাবনায় ৩ মার্চ পুলিশ লাইনে জনতা ও পুলিশের যৌথ সমাবেশ হয়। পুলিশ বাহিনী এ সভায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ হোসেন এম এন এ পুলিশ ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান। এখানে পুলিশ সুপার আবদুল গাফফারের নেতৃত্বে পুলিশ প্রতিরোধ রচনা করে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার পুলিশের সকল অস্ত্র, গোলাবারুদ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। ২৭ মার্চ পাকবাহিনী পুলিশ বাহিনীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু পুলিশ বাহিনী এ নির্দেশ অমান্য করলে যুদ্ধ শুরু হয়। পুলিশ ও মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথ বাহিনীর কাছে টিকতে না পেরে সেদিন পাকবাহিনী পিছু হটে যায়। সেদিন রাতে পুলিশের সঙ্গে আবারো সংঘর্ষ হয় এবং ২৮ মার্চ পাকবাহিনীর হাত থেকে পাবনা মুক্ত হয়। যদিও পরবর্তীকালে এপ্রিলে পাবনা পাক সেনাদলের দখলে চলে যায়। পাবনায় প্রতিরোধ যুদ্ধ ও রণাঙ্গনে বহু পুলিশ শহীদ হন। ৩০ মার্চ পর্যন্ত বগুড়া পুলিশ লাইন পুলিশদের দখলে ছিল। ৩০ মার্চ পাকবাহিনীর হাতে পুলিশ লাইনের পতন ঘটে।

খুলনা: খুলনা বিভাগের পুলিশ বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। ঝিনাইদহ মহকুমার পুলিশ কর্মকর্তা মাহবুবউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই যুদ্ধ ও সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধ পরিচালনায় অপরিসীম কৃতিত্বের জন্য ১০ এপ্রিল তাঁকে ক্যাপ্টেন পদে ভূষিত করা হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করেন। তিনি ছিলেন ৮ নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার। তাঁর নেতৃত্বে ঝিনাইদহে ৪০০ মুক্তিযোদ্ধার বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এ বাহিনী ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গায় অপরিসীম রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন ২৫ মার্চে পাক মেজর শফিকের বাহিনী আক্রমণ করে নির্বিচারে বাঙালি পুলিশদের হত্যা করে। ৩০ মার্চে পুলিশ ইপিআরসহ পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। ঐ দিন সন্ধ্যায় পুলিশ লাইন সহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মুক্তিযোদ্ধা ও জনতা দখল করে নেয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে খুলনায় তৎকালীন এসপি আবদুর রকিব খন্দকার মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেন। তাঁর নির্দেশে সাতক্ষীরা মহকুমা পুলিশ অফিসার ট্রেজারি থেকে সংগ্রাম কমিটিতে ৩৫০টি রাইফেল ও ত্রিশ/চল্লিশটি গুলি ভরা বাক্স

দেন। সংগ্রাম কমিটির পক্ষে মুস্তাফিজ, কামরুল ইসলাম, মাসুদ, এনামুল, হাবলু এ অস্ত্র গ্রহণ করেন। তেরখাদার এমপিএ ডা. মনসুর আলীকে রকিব খন্দকার ৭০টি রাইফেল ও ৪০ হাজার গুলি প্রদান করেন। তেরখাদা থানার ওসি বাবু নিরঞ্জন ঘোষ ও পুলিশ ফোহাম উদ্দিন ও বোরহান উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধাদের তেরখাদা হাইস্কুল মাঠে ট্রেনিং দিতেন। এছাড়া সাতক্ষীরা থানার তৎকালীন ওসি আবদুল হাকিম মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেন।

বরিশাল: বরিশালে পুলিশ বাহিনীর সাব-ইন্সপেক্টর মুহাম্মদ বাদশা মিয়া, সুবেদার আকবর মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এ ভূমিকা রাখেন। বরিশালের এসপি ফখরুদ্দিন, অতিরিক্ত এসপি গোলাম হোসেন (শহীদ) মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন। পুলিশের ৫০০ রাইফেল মার্চ মাসেই স্থানীয় এমসিএ নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে দেয়া হয়। গোলাম হোসেন এপ্রিলে পাক সেনার হাতে ধরা পড়েন এবং নিখোঁজ হন। পিরোজপুরের মহকুমা পুলিশ অফিসার ফয়জুর রহমান আহমদ এবং দূর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তা হীরেন্দ্র মহাজনকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার অপরাধে পাক সৈন্যরা হত্যা করে।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে সশস্ত্র পাকবাহিনী বাঙালি নিধনযজ্ঞে নামার সাথে সাথে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, দিনাজপুরে প্রতিরোধ বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠলেও সবগুলো ঘটনার মূল উৎস ছিল ইপিআর হেডকোয়ার্টার পিলখানা ও পুলিশ সদর দপ্তর রাজারবাগ। পাকিস্তানিদের পিলখানা ও রাজারবাগ আক্রমণের খবর সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই বাঙালি সশস্ত্র ব্যক্তিরা অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসে। প্রাথমিক পর্যায়ে সমগ্র বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা লক্ষ করা গেছে তাহলো সবাই কেবল আত্মরক্ষার তাগিদেই অস্ত্র হাতে অগ্রসর হয়েছেন। এ প্রতিরোধ ছিল বিচ্ছিন্ন। সশস্ত্র প্রতিরোধ বা যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুতি থাকার প্রয়োজন তা ছিল না। তাই প্রতিরোধ সহজেই ভেঙ্গে যায় এপ্রিল মাসে। অবশ্য মে মাসে সেক্টরগুলো ক্রিয়াশীল হলে পরিকল্পিত যুদ্ধ শুরু হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র* , পঞ্চম খন্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪।

২। রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিরোধের প্রথম প্রহর*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯১।

৩। বাংলাদেশ রাইফেলস, *মুক্তিযুদ্ধ ও রাইফেলস*, ঢাকা, ১৯৭৭।

৪। আবু মো:দেলোয়ার হোসেন, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৫।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মুক্তিযুদ্ধকালে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য সংখ্যা ছিল-

(ক) ৫০০০ (খ) ৬৫০০

(গ) ৬০০০ (ঘ) ৮০০০।

২। বর্তমান বিডিআর-এর পাকিস্তান আমলে নাম ছিল-

(ক) ইপিআর (খ) ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
(গ) ইস্ট পাকিস্তান (ঘ) বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

৩। মুক্তিযুদ্ধকালে পিলখানায় অবস্থানরত বাঙালি ইপিআরের সংখ্যা ছিল-
(ক) ২৭০০ (খ) ২৪০০
(গ) ২৫০০ (ঘ) ২৮০০।

৪। কুষ্টিয়ায় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভে ইপিআর বাহিনীর নেতৃত্ব দেন-
(ক) মেজর গিয়াস (খ) মেজর আনোয়ার
(গ) মেজর আবু ওসমান। (ঘ) মেজর রফিক।

৫। প্রতিরোধ যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী শহীদ পুলিশের ডিআইজি হচ্ছেন-
(ক) ৫০ (খ) ৪৯
(গ) ৩৯ (ঘ) ৩৮।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশে অবস্থানরত বাঙালি সৈন্য, ইপিআর ও পুলিশের অবস্থান ও সংখ্যা সম্পর্কে লিখুন।

২। ইপিআর পিলখানা ও চট্টগ্রামে কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। কুষ্টিয়ায় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ইপিআর-এর প্রতিরোধ সম্পর্কে টীকা লিখুন।

৪। রাজারবাগ ও চট্টগ্রামের দামপাড়া পুলিশ লাইনে পুলিশের প্রতিরোধ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ১৯৭১ সালের মার্চ-মে মাস পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সৈনিক ও পুলিশের প্রতিরোধ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩

বাংলাদেশকে ১১ সেক্টর বিভক্তিকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *মুক্তিযুদ্ধকালে সেক্টর গঠনের কারণ নির্ণয় করতে পারবেন;*
- *সেক্টর গঠনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে পারবেন;*
- *১১ সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত এলাকার বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং সাফল্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *তিনটি ব্রিগেড ফোর্স সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত হতে বাঙালির ওপর গণহত্যা শুরু করে। তাদের প্রধান লক্ষবস্তু হয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেনানিবাস ও ইপিআর উইং, পুলিশসহ আধা সামরিক বাহিনীর অবস্থানগুলো। এসব স্থান থেকে পালিয়ে আসা অফিসার ও সৈনিকদের বড় অংশ হাতের কাছে যা ছিল তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করে। যদিও সুসজ্জিত হানাদার বাহিনীর সঙ্গে পেরে না ওঠে এক পর্যায়ে তারা পিছু হটে যায়। এরি মধ্যে ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে যুদ্ধ আরো সংগঠিত ও পরিকল্পিত রূপ লাভ করে। গড়ে ওঠে মুক্তিফৌজ। ১৭ এপ্রিল সরকার যুদ্ধরত আঞ্চলিক কমান্ডারদের নিয়ে গঠন করে এই ফৌজ যা পরবর্তীকালে ১১টি সেক্টর বিভক্ত হয়। এছাড়া গঠিত হয় ৩টি বিগ্রেড ফোর্স। এভাবে একক কমান্ডের অধীনে যুদ্ধে বাঙালি ক্রমান্বয়ে সাফল্য লাভ করতে থাকে।

ক. সেক্টর গঠনের কারণ

যেকোন দেশের মুক্তিযুদ্ধই দ্রুত সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত এর সশস্ত্র চরিত্র এবং একক কমান্ড। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুব শিবির এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন ছিল। একক কমান্ড গড়ে তোলার পেছনে অন্যান্য আরো যেসব কারণ ছিল তা হলো- প্রথমত, যেসমস্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার বাহিনীর সদস্য বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে একক কমান্ডে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত, পাকবাহিনীর মনোবল, শক্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় সাপেক্ষে যুদ্ধ কৌশল তৈরি করা। তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী বিভিন্ন সামরিক অফিসারদের দায়িত্বে নিয়োগ ও যুদ্ধ এলাকা নির্ধারণ করে যুদ্ধে শৃংখলা আনা। চতুর্থত, বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও কৃষক-শ্রমিকের মধ্যে থেকে যারা যুদ্ধে অংশ নিতে ইচ্ছুক তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে নিয়োগ করা। পঞ্চমত, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সজ্জিত করা। ষষ্ঠত, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিষ্ঠা করা। এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিয়মিত ও অনিয়মিত (গণবাহিনী) বাহিনীকে একই কমান্ডের অধীনে আনা হয়।

খ. সেক্টর গঠনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুটিকয়েক অবিবেচক ছাড়া সকলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। প্রতিরোধ যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্রসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে পুনর্গঠিত করার প্রয়োজনীয়তা প্রথম থেকেই উর্ধ্বতন বাঙালি অফিসাররা অনুভব করেছিলেন। ৪ এপ্রিল সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মেজর শফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশারফ, মেজর এম. নূরুজ্জামান, মেজর নূরুল ইসলাম, কর্নেল রবসহ অনেক পদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এখানে পরিকল্পিত যুদ্ধ ছাড়াও রাজনৈতিক সমর্থন গঠন ও গোলাবারুদ সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনা হয়। ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর সরকার সামরিক প্রশাসন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এ পর্যায়ে বাংলাদেশ বাহিনী গঠিত হয় যার হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় কোলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে। ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণের পর আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় মুক্তিফৌজ বা মুক্তিবাহিনী যার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন ওসমানী।

ইতোমধ্যে ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশকে মোট চারটি সেক্টরে ভাগ করে। চট্টগ্রাম সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন মেজর জিয়া, কুমিল্লা সেক্টরের মেজর খালেদ মোশাররফ, সিলেট সেক্টরের মেজর শফিউল্লাহ এবং কুষ্টিয়া সেক্টরের মেজর আবু ওসমান। পরের দিন নাজমুল হককে দিনাজপুর-রাজশাহী-পাবনা এলাকা, মেজর জলিলকে বরিশাল-পটুয়াখালী এলাকা, ক্যাপ্টেন নওয়াজেশকে রংপুর এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়।সারা দেশের মুক্তিযুদ্ধকে আরো বেগবান করার লক্ষে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী সকল সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিবর্গকে যথোপযুক্ত দায়িত্ব নিয়োগ করা এবং যুদ্ধ এলাকা নির্ধারণের জন্য সেক্টরগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশে ১১-১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সভাপতিত্বে সেক্টর কমান্ডারদের অধিবেশনের সীমানা চিহ্নিতকরণ, বাংলাদেশের অভ্যন্ড়রে গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন ইত্যাদি রণনীতি প্রণয়ন করা হয়। কর্নেল রবকে বাংলাদেশ বাহিনীর চিফ অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকারকে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে বিভক্ত করে সীমানা চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি সেক্টরে একজন কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।

গ. ১১ সেক্টরের পরিচয়

এক নম্বর সেক্টরঃ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত নিয়ে গঠিত।

দুই নম্বর সেক্টরঃ নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ।

তিন নম্বর সেক্টরঃ আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা জেলার অংশবিশেষ ও কিশোরগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত।

চার নম্বর সেক্টরঃ সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাউবি সড়ক নিয়ে গঠিত।

পাঁচ নম্বর সেক্টরঃ সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল সিলেট-ডাউকি সড়ক হতে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত।

ছয় নম্বর সেক্টরঃ রংপুর ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা নিয়ে গঠিত।

সাত নম্বর সেক্টরঃ দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা নিয়ে গঠিত।

আট নম্বর সেক্টরঃ কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনা জেলার দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত।

নয় নম্বর সেক্টরঃ দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুর জেলা অংশবিশেষ এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে গঠিত।

দশ নম্বর সেক্টরঃ দশ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ কমান্ডের, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ।

এগার নম্বর সেক্টরঃ কিশোরগঞ্জ ছাড়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে গঠিত।

ঘ. ১১ সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও সাফল্য

এক নম্বর সেক্টরঃ এই সেক্টরভুক্ত ছিল চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর একাংশ। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান (জুন পর্যন্ত), পরে সেক্টর কমান্ডার হন মেজর রফিকুল ইসলাম। এই সেক্টর ৫টি সাব সেক্টরে বিভক্ত ছিল- ঋষিমুখ সাব-সেক্টর, শ্রীনগর সাব-সেক্টর, মনুঘাট সাব-সেক্টর, তবলছড়ি সাব-সেক্টর ও ডিমাগিরী সাব-সেক্টর। ১ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল হরিণা। জুলাই মাসে জেড ফোর্স গঠিত হলে মেজর জিয়ার স্থলাভিষিক্ত হন মেজর রফিক। এছাড়া প্রতি সাব সেক্টরে ছিলেন একজন করে সাব-সেক্টর কমান্ডার। এই সেক্টরের অধীনে নিয়মিত সৈন্য ছিল ২,০০০। এর মধ্যে ১,৪০০ ইপিআর, ২০০ পুলিশ, ৩০০ সেনাবাহিনী এবং ১০০ নৌ বাহিনী ও বিমান সেনা। এছাড়া বেসামরিক গণবাহিনী ছিল প্রায় ৮,০০০। এই সেক্টরের প্রথম পরিকল্পিত যুদ্ধ ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কুমিরার যুদ্ধ। ৩ দিন স্থায়ী এই যুদ্ধের পর ২৮ মার্চ কুমিরা পাকবাহিনীর দখলে চলে যায়। ২০ এপ্রিল মিরশ্বরাই থানায় পাকবাহিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়। এই সেক্টরে মে-জুন মাসে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ চাঁদগাজী যুদ্ধ, চিকনছাড়া যুদ্ধ। এসব যুদ্ধে বেশ কযেকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। জুলাই থেকে আরো অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা যোগ দিলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস বেড়ে যায়। জুলাই মাসে দেবীপুর বিওপি, কবুইয়া বাজার, হিয়াকুতে পাকসেনাদের হেড কোয়ার্টারে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালিয়ে শত্রু বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি করে। এ মাসেই আমলিকা তাদের অধিকার আসে। ১ নম্বর সেক্টরে তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পায় সেপ্টেম্বর মাসে।এ মাসেই ছাগলনাইয়া বিওপি এবং পরের মাসে সলিয়াদীঘি যুদ্ধে বাঙালিরা সাফল্য লাভ করে। নভেম্বর মাসে চাঁদগাজীর যুদ্ধেও মুক্তিবাহিনীর সাফল্য অর্জিত হয়। ডিসেম্বরের শুরুতে ২ নম্বর সেক্টরের সঙ্গে যৌথ অভিযানে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটে যায়। ১ ডিসেম্বর ছাগলনাইয়া শত্রুমুক্ত হয়। ১২ ডিসেম্বর সীতাকুন্ড, ১৬ ডিসেম্বর কুমিরা ও চট্টগ্রাম হানাদার বাহিনী মুক্ত হয়। ১ নম্বর সেক্টরের বিভিন্ন যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার ছাড়াও নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টন মাহফুজ, লে. শওকত, ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন অলি, ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা প্রমুখ।

দুই নম্বর সেক্টরঃ এই সেক্টরভুক্ত ছিল নোয়াখালী, আখাউড়া-ভৈরব, রেললাইন পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা, সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা ও ফরিদপুরের কিছু এলাকা। প্রথম এই সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন খালেদ মোশাররফ। পরে এই দায়িত্ব পান মেজর এ.টি.এম. হায়দার। এই সেক্টরের অধীনে ছিল ৩০ হাজারের

মতো গেরিলা সৈনিক। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪ হাজার। ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ এই সেক্টরকে ৬টি সাব সেক্টরে ভাগ করেন। এগুলো ছিল- **১.** গঙ্গাসাগর, আখাউড়া এবং কসবা সাব-সেক্টর; **২.** মন্দভাগ সাব-সেক্টর; **৩.** শালদা নদী সাব-সেক্টর; **৪.** মতিনগর সাব-সেক্টর; **৫.** গোমতীর দক্ষিণে নির্ভরপুর সাব-সেক্টর ও **৬.** রাজনগর সাব-সেক্টরের। সেপ্টেম্বরের পর এই সেক্টরে কমান্ডার হন মেজর হায়দার।

জুন মাস থেকে এই সেক্টরের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এই সেক্টরের শালদা নদীর যুদ্ধ, বেলোনিয়া যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ। ১০ জুন সংঘটিত বেলোনিয়ার যুদ্ধে ৩০০-এর মতো পাক সেনাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের বদলা নিতে পাকবাহিনী জুলাই মাসের মাঝামাঝি বেলোনিয়াতে আবার মুক্তিবাহিনীর মুখোমুখি হয়। এসময় পাকবাহিনী হেলিকপ্টার যোগে সৈন্য অবতরণ করে। অবশ্য এ যুদ্ধে বেলোনিয়া মুক্তিবাহিনীর হাতছাড়া হয়। এরপর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরেও শালদা নদী এলাকায় যুদ্ধ হয়। অক্টোবরে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা শালদা নদী রেলওয়ে স্টেশন মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। এ মাসে কসবা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। ১০ জুন বেলোনিয়াতে পাকবাহিনী প্রবেশ করে এবং ঔই দিনের যুদ্ধে ৩০০ পাক সেনা নিহত হয়। এ পরাজয়ের গ্লানি মোছার জন্য পাকবাহিনী ১৭ জুলাই মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। পরের দিন পাকিস্তানিদের হাতে বেলোনিয়ার পতন ঘটে। অক্টোবর মাস পর্যন্ত বেলোনিয়া তাদের দখলে থাকে। নভেম্বরে আবার বেলোনিয়ায় যুদ্ধ হয় এবং মুক্তিবাহিনী পুনরায় এটি দখল করে। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে ফেনী ও নোয়াখালী শত্রুমুক্ত হয়। এরপর মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম দখল করে। ২ নম্বর সেক্টরে কমান্ডার ছাড়াও যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন দিদার, মেজর মতি, ক্যাপ্টেন সালেক প্রমুখ।

তিন নম্বর সেক্টর: এই সেক্টরের আওতাধীন এলাকা ছিল উত্তরের সিলেট শ্রীমঙ্গলের কাছাকাছি থেকে দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পর্যন্ত। যার অন্তর্ভুক্ত ছিল হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজারের অংশ এবং নারায়ণগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের অংশবিশেষ। এই সেক্টরে গেরিলা সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। এই সেক্টরে সাব-সেক্টর ছিল ১০টি। তিন নম্বর সেক্টরের প্রতিটি সাব সেক্টরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা অব্যাহত ছিল। জুন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয় তেলিয়াপাড়া, আখাউড়া ও মাধবপুরে। জুলাই মাসে নরসিংদী, কাপাসিয়া, মনোহরদী ও কিশোরগঞ্জের কয়েকটি থানায় মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা চালানো হয়। তবে অক্টোবর থেকে গেরিলাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এ মাসে 'এস' ফোর্স গঠিত হয়। মেজর শফিউল্লাহর বদলে সেক্টর কমান্ডার হন মেজর নূরুজ্জামান। সেপ্টেম্বর মাস থেকে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয় আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মনতলা, তেলিয়াপাড়ায়। এসব যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী সাফল্য লাভ করে। ডিসেম্বরের ১৩ তারিখের মধ্যে আশুগঞ্জ, ভৈরব, নরসিংদী মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে এবং পরের দিন তারা ঢাকা অভিমুখে রওনা হন। এভাবে ৩ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর বিজয় সূচিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছাড়াও এ সেক্টরে নেতৃত্ব দেন মেজর মঈন, মেজর মতিউর, ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভূঁইয়া, ক্যাপ্টেন মতিন, মেজর নাসিম প্রমুখ।

চার নম্বর সেক্টর: ৪ নম্বর সেক্টর সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট ডাউকি সড়ক পর্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল সীমান্ত এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। মোট ৬টি সাব সেক্টরে বিভক্ত ছিল এই সেক্টর। এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর সি.আর.দত্ত। সেক্টরে গেরিলা সংখ্যা ছিলো ৮,০০০ এবং নিয়মিত বাহিনী ছিল ৪,০০০। প্রথমে সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল করিমগঞ্জ পরে নাসিমপুর।

মে মাস থেকেই এই সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। জুন-আগস্ট মাস পর্যন্ড় এই সেক্টর এলাকায় ব্যাপক গেরিলা তৎপরতা চালানো হয়। দিলকুশা, জুরী, শাহবাজপুর বেশ কয়েকটি যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী সাফল্য অর্জন করে এবং বেশ কয়েকটি এলাকা স্থায়ীভাবে তারা দখল করে নেয়। সেপ্টেম্বরে বিয়ানীবাজার, বড়লেখা ও জকিগঞ্জে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। পরের মাসে জেড ফোর্সের একটি অংশ মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়ায় এই সেক্টরের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। ১০ নভেম্বর আটগ্রামে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় রকমের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ৪০ জন পাক সেনা নিহত হয়। দীর্ঘদিন যুদ্ধের পর নভেম্বরের ২০/২১ তারিখে জকিগঞ্জ ও আটগ্রাম হানাদার বাহিনী মুক্ত হয়। ডিসেম্বর মাসে পাকবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি কানাইরঘাট মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয়। এ সেক্টরে পাকিস্তানিদের শেষ শক্ত ঘাঁটি খাদিমনগর মুক্তিবাহিনী দখল করে ১৫ ডিসেম্বর। এর সাথে সাথে চার নম্বর সেক্টর শত্রুমুক্ত হয়। এ সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর সি. আর. দত্ত ছাড়াও নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন মাসুদুর রব, ক্যাপ্টেন এনাম, লে.জহির প্রমুখ। জেড ফোর্স প্রধান মেজর জিয়াও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

পাঁচ নম্বর সেক্টরঃ পাঁচ নম্বর সেক্টর সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। সেক্টরের সংকেতিক নাম ছিল 'টাইগার লিডার'। ৬টি সাব সেক্টরে সেক্টরটি বিভক্ত ছিল। রাস্তাঘাটের অভাব, দুর্গম এলাকা, প্রতিকূলশ প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ছাতক, রাধানগরও টেংরাটিলা ছাড়া প্রায় ২০০ বর্গমাইল এলাকা মুক্ত করা হয়। অক্টোবর মাসে জেড ফোর্সের অধীন মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল এ সেক্টরে যোগ দিলে সেক্টরের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অক্টোবর থেকে বড় রকমের যুদ্ধ হয় নিকলি, ছাতক, সাচনা-জামালগঞ্জ, টেকেরঘাট, গৌরীনগর, রাধানগর, তাহিরপুর, আজমিরীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, টেংরাটিলা। ছাতকে বড় রকমের যুদ্ধ হয় ১৩-১৯ অক্টোবর। মোট চার শতাধিক পাক সৈন্য এতে নিহত হয়। ৩০ নভেম্বর রাধানগর কমপ্লেক্স মুক্তিবাহিনী দখল করে। অবশ্য ডিসেম্বরের প্রথম দিক থেকেই মুক্তিবাহিনী আরো সাফল্য লাভ করতে থাকে। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ৫ নম্বর সেক্টরের সমস্ত এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। এ সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার ছাড়া যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন সুবেদার মেজর বি আর চৌধুরি, লে. তাহের আখঞ্জী, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মুসলিম প্রমুখ। এই সেক্টরে এক হাজার নিয়মিত বাহিনী ও ৯ হাজার গণবাহিনী সহ মোট ১০,০০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

ছয় নম্বর সেক্টরঃ ছয় নম্বর সেক্টর গঠিত হয় রংপুর ও ঠাকুরগাঁও নিয়ে। উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার এর কমান্ডার ছিলেন। মোট ১০০০ নিয়মিত ও ১০,০০০ গণবাহিনীসহ ১১,০০০ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সেক্টর গঠিত ছিল। মোট ৫টি সাব সেক্টরে সেক্টরটি বিভক্ত ছিল। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল পাটগ্রামের বুড়ীমারীতে। প্রথমদিকে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল জগদলঘাট, ফুলবাড়ি, পচাগড়া, ভুরঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, রায়গঞ্জ, জয়মনিরহাট। নভেম্বরের মধ্যেই মুক্তিবাহিনী পঞ্চগড় এবং নাগেশ্বরী, পাটেশ্বরী পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরপর নভেম্বরে কুড়িগ্রাম দখলের পর সেক্টরর্ভুক্ত রংপুর ও সৈয়দপুর ছাড়া সমগ্র সেক্টরটি মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। ২০ নভেম্বর মুক্তবাহিনী রায়গঞ্জ আক্রমণ করে। প্রায় ৩০০-৫০০ পাক সৈন্য যুদ্ধে হতাহত হয়। মুক্তিবাহিনী রায়গঞ্জ দখল করে। এই সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার ছাড়াও নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন মতিয়ুর, ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ, স্কোয়াড্রন লিডার সদরউদ্দিন, সুবেদার হাফিজ প্রমুখ।

সাত নম্বর সেক্টর: রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে এই সেক্টর গঠিত ছিল। মেজর নজমুল হক ছিলেন সেক্টর কমান্ডার। কিছুদিন সুবেদার মেজর এ. রবও সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। অবশ্য মেজর নজমুল সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হলে কাজী নুরুজ্জামান এর সেক্টর কমান্ডার হন এবং ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। মোট ৮টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয় এই সেক্টরকে। ২,০০০ নিয়মিত ও ২,০০০ গেরিলা নিয়ে এ সেক্টর গঠিত ছিল। মে মাস থেকেই সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায়।এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে ঠননিয়াপাড়া, কাঞ্চন সেতু যুদ্ধ, কলাবাড়ি যুদ্ধ, রোহনপুর, শাহপুর গড়, আলমপুর, কানসাট, দূর্গাপুর, মীরগঞ্জ যুদ্ধ। আগস্টে রাজশাহীর মীরগঞ্জ যুদ্ধে ৩০ জন পাকসেনা মারা যায়। নভেম্বর মাসে দিনাজপুর জেলার খানপুর বিওপি যুদ্ধে আরো ৩০ জন পাকসেনা নিহত হয়। একই মাসের শেষ দিকে পোড়াগ্রাম যুদ্ধে ৩০ জন পাক সেনা ও ৫০ জন রাজাকার মারা যায়। এ সেক্টরের সর্বশেষ বড় যুদ্ধ হয় ১০ ডিসেম্বর নবাবগঞ্জের যুদ্ধ। দীর্ঘ এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ১৪ ডিসেম্বর সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। ১৬ ডিসেম্বর এই সেক্টর শত্রুমুক্ত হয়। ৭ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার ছাড়াও যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন মেজর গিয়াস, ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর. লে. রফিক প্রমুখ।

আট নম্বর সেক্টর: কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা জেলার কিছু অংশ নিয়ে এই সেক্টর গঠিত ছিল। আগস্ট পর্যন্ত মেজর আবু ওসমান এবং এরপর মেজর মঞ্জুর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ২ হাজার নিয়মিত এবং ৮ হাজার গণবাহিনীসহ এ সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০,০০০। মোট ৭টি সাব সেক্টরে এই সেক্টর বিভক্ত ছিল। এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো বায়রা, কাশিপুর, কাগজপুকুরিয়া, মুজিবনগর, ভোমরা, ভাটিয়াপাড়া, বর্ণি, গয়েসপুর, বালিয়াডাঙ্গা, মুজিবনগর, গৌরপুর যুদ্ধ। এসব যুদ্ধে বহু পাকিস্তানি সৈন্য নিহত এবং তাদের অনেক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এপ্রিলে কাগজপুকুরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করলে বেনাপোল এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে যা যুদ্ধের ন'মাস শত্রু বাহিনীর অধিকারে যায়নি। নভেম্বরে এই সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর অভিযান আরো ত্বরান্বিত করা হয়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জীবননগর থানা, লোহাগড়া, কালিয়া থানা, নড়াইল জেলা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। ১২ ডিসেম্বর ফরিদপুরের ভাটিয়াপাড়ায় ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। দীর্ঘ যুদ্ধের পর ১৫০ জন পাকসেনা ১৮ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।

নয় নম্বর সেক্টর: বরিশাল-পটুয়াখালী, দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে নয় নম্বর সেক্টর গঠিত ছিল। মেজর জলিল ছিলেন সেক্টর কমান্ডার। তিনটি সাব সেক্টরে এই সেক্টরটি বিভক্ত ছিল। এই সেক্টরে ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর, ক্যাপ্টেন মেহদী, হেমায়েত মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলেন। খুলনা, চালনা, সুন্দরবন এলাকায় মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানিদের ওপর হামলা চালিয়ে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে।এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে শ্রীপুর, দেবহাট, কপিলমুনি, বসন্তপুর, কৈখালী, খানজী, শ্যামনগর, গোয়ালডাঙ্গা, কালিগঞ্জ যুদ্ধ। ২০ আগস্ট শ্যামপুর যুদ্ধে এ থানা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। নভেম্বরের শেষদিকে কপিলমুনির যুদ্ধের পর পাইকগাছা থানার বড় অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। ২০ নভেম্বর কালিগঞ্জ থানা শত্রুমুক্ত হয়। ডিসেম্বরের প্রথম থেকে মুক্তিবাহিনী ব্যাপক সংঘর্ষ চালায়। ১০ ডিসেম্বর মিত্র ও মুক্তিবাহিনী যৌথ অভিযান চালায়। ক্যাপ্টেন বেগ ও নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের কাছে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। নবম সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল ছাড়াও নেতৃত্ব দেন স্টুয়ার্ড মুজিব হেমায়েত, ক্যাপ্টেন শাহজাহান, ক্যাপ্টেন মেহদী, ক্যাপ্টেন জিয়া, সুবেদার মেজর মজিদ প্রমুখ।

দশ নম্বর সেক্টর: দশ নম্বর সেক্টরের অর্ধীনে ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা, নদী ও সমুদ্র বন্দরসহ বাংলাদেশের সমগ্র জলপথ। এর সদর দপ্তর ছিল মুর্শিদাবাদের পলাশী। সেক্টর অধিনায়ক ছিলন স্বয়ং কর্নেল ওসমানী। মোট ৫১৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডো নিয়ে এ সেক্টর গঠিত ছিল। আগস্ট মাস থেকে এই সেক্টরের তৎপরতা শুরু হয়। এবং এ মাসেই চট্টগ্রাম বন্দরে এম ভি হুরমুজ ও এম ভি আব্বাস জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। এই অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন জ্যাকপট'। ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে নৌ-কমান্ডোরা ১২টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২১টি পাকিস্তানি জাহাজ ধ্বংস করেন নৌ-কমান্ডোরা। গেরিলাদের বার বার আক্রমণে চট্টগ্রাম বন্দরে জেটিগুলো প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। তাদের তৎপরতার ফলে পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। মুক্তিযুদ্ধকালে বড় ধরনের ৪৫টি অভিযানে ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়। এভাবে ১০ নম্বর সেক্টরের অভিযানের ফলে বিশ্বের দরবারে মুক্তিযুদ্ধ পরিচিত লাভ করে। বিদেশী কোন জাহাজ সেপ্টেম্বরের পর আর চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরে আসতে রাজি হয়নি। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের বড় অংশই ছিল বিদেশী।

এগার নম্বর সেক্টর: কিশোরগঞ্জ মহকুমা ছাড়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলাকে এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৫ নভেম্বর মেজর আবু তাহের আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন এর কমান্ডার। পরে স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ সেক্টর কমান্ডার হন। এই সেক্টর ৮টি সাব সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। প্রায় ২৫,০০০ মুক্তিযোদ্ধা এই সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ মুক্তাগাছা, নালিতাবাড়ি, কামালপুর, বাহাদুরবাদ যুদ্ধ, নকশী যুদ্ধ, রৌমারী যুদ্ধ, চিলমারী যুদ্ধ। এসব যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি করে মুক্তিবাহিনী সাফল্য লাভ করে। অক্টোবরের মাঝামাঝি নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকা মুক্তিবাহিনীর অধীনে আসে। ১৫ নভেম্বর কামালপুরে পাকবাহিনীর সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। কর্নেল তাহের এ যুদ্ধে আহত হন। নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী নালিতাবাড়ি, শেরপুর থেকে দূর্গাপুর পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা দখল করে নেয়। ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই এই সেক্টরের সৈন্যরা ময়মনসিংহের দিকে এগিয়ে আসেন। ১১ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা পরাজয় স্বীকার করে এবং ৫৮১ জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে। বিজয়ী বাহিনীর একটি অংশ টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকা পৌঁছেন। সেক্টর কমান্ডার ছাড়াও নাজমুল হক, আমীন আহমেদ চৌধুরী, সুবেদার মেজর জিয়াউল হক, ডা. মামুন নেতৃত্ব দেন। জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঙ. ব্রিগেড ফোর্স

১১টি সেক্টর ও অনেকগুলো সাব-সেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গনকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন 'জেড ফোর্স', মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ ছিলেন 'এস ফোর্স', এবং মেজর খালেদ মোশাররফ ছিলেন 'কে ফোর্স'-এর অধিনায়ক। জুন মাসে ১ম, ৩য় এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে জেড ফোর্স গঠিত হয়। মে মাসে ২য় ইস্ট বেঙ্গল ও ৩ নং সেক্টর নিয়ে এস ফোর্স গঠিত হয়। মে মাসে ৪র্থ, ৯ম, ১০ম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে কে ফোর্স গঠিত হয়।

সারসংক্ষেপ

মুজিবনগর সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে রণকৌশলের দিক দিয়ে ১১টি সেক্টর ও ৩টি ব্রিগেডে বিভক্তিকরণের ফলে যুদ্ধ পরিকল্পিত রূপ লাভ করে। সেক্টরের নিয়মিত বাহিনী এবং বিপুল সংখ্যক গণবাহিনীর সদস্য এবং স্থানীয়ভিত্তিক গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা দলগুলো সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালের জুন-জুলাই এরপর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায়। সামান্য অস্ত্র নিয়ে শুধুমাত্র মনোবল ও দেশপ্রেমকে সম্বল করে একটি শক্তিশালী বাহিনীকে পরাভূত করা সম্ভব হয়। বহু যোদ্ধার আত্মত্যাগের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর ঈপ্সিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, দশম খন্ড*, ঢাকা, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪।

২। কে. এম. মোহসীন, মেজর রফিকুল ইসলাম, "মুক্তিযুদ্ধ সামরিক ও বেসামরিক প্রতিরোধ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খন্ড*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০।

৩। মোঃ খলিলুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ ও নৌ-কমান্ডো অভিযান*, ঢাকা, শিরীন রহমান, ১৯৯৭।

৪। মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এগারটি সেক্টর বিজয় কাহিনী*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯১।

৫। এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৫।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্তি করার আগে এপ্রিল মাসে উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়-

(ক) সিলেটের মনতলা (খ) সিলেটের তেলিয়াপাড়া

(গ) মুজিবনগর (ঘ) কলকাতা।

২। মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজের প্রধান নিযুক্ত হন-

(ক) মেজর জিয়াউর রহমান (খ) শেখ মুজিবুর রহমান

(গ) তাজউদ্দিন আহমদ (ঘ) কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী।

৩। চট্টগ্রাম শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল-

(ক) ১ নম্বর সেক্টরে (খ) ২ নম্বর সেক্টরে

(গ) ৫ নম্বর সেক্টরে (ঘ) ১১ নম্বর সেক্টরে।

৪। সমুদ্র ও নৌপথগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল-

(ক) ১ নম্বর সেক্টরে (খ) ১০ নম্বর সেক্টরে

(গ) ৫ নম্বর সেক্টরে (ঘ) ১১ নম্বর সেক্টরে।

৫। ৬ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন-

(ক) মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ (খ) মেজর জলিল

(গ) উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার (ঘ) মেজর খালেদ মোশাররফ।

৬। বাঙালি নৌ-কমান্ডো কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধকালে ডুবিয়ে দেয়া জাহাজের সংখ্যা-

(ক) ১২৬ টি (খ) ১৬২ টি

(গ) ১৪২ টি (ঘ) ১১৬ টি।

৭। মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত 'কে' ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন-

(ক) মেজর জিয়া (খ) মেজর শফিউল্লাহ

(গ) মেজর কাজী নুরুজ্জামান (ঘ) মেজর খালেদ মোশাররফ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। মুক্তিযুদ্ধকালে সেক্টর গঠনের কারণ নির্ণয় করুন।

২। কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় লিখুন।

৩। বাংলাদেশকে যে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় সেই এলাকাগুলোর নাম সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর গঠনের কারণ ও প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন। ১১টি সেক্টরের আওতাভুক্ত এলাকা চিহ্নিত করুন।

২। মুক্তিযুদ্ধে গঠিত ১১টি সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও এর সাফল্য পর্যালোচনা করুন।

পাঠ-৪

নিয়মিত, অনিয়মিত বিভিন্ন সশস্ত্রবাহিনী

উদ্দেশ্য
এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর পরিচয় জানতে পারবেন;*
- *মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নিয়মিত বাহিনীর গঠন আলোচনা করতে পারবেন;*
- *নিয়মিত বাহিনীর বাইরে অঞ্চলভিত্তিক অনিয়মিত বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক বাহিনী যেমন- মুজিব বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, আফসার ব্যাটালিয়ন, হেমায়েত বাহিনী, হালিম বাহিনী ইত্যাদির বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *নিয়মিত বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধে কার্যক্রম ও সাফল্য বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *অনিয়মিত বাহিনীর কার্যক্রম ও সাফল্য মূল্যায়ন করতে পারবেন।*

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বাঙালি সেনাবাহিনী, প্রাক্তন ইপিআর, পুলিশ, ছাত্র-জনতার ওপর অতর্কিত হামলার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বাঙালিরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন, প্রাক্তন ইপিআর, পুলিশ, আনসার, কোথাও কোথাও ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিকদের সহায়তায় বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। যদিও ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে স্বতস্ফূর্তভাবে এবং অনেকটা অপরিকল্পিত। কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগের পর তিনি নিয়মিত বাহিনীর সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নেন এবং ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলেন সেক্টর, ফোর্স বাহিনী, নিয়মিত সেনা, বিমান, নৌবাহিনী। পাশাপাশি স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অনিয়মিত বাহিনী, বেসামরিক বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকসহ (গণবাহিনী) সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে গড়ে তোলেন বিশাল মুক্তিবাহিনী। এভাবে নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সম্মিলিতভাবে যুদ্ধে সাফল্যের ফলে বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হয় এবং স্বাধীনতা লাভ করে।

ক. নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর পরিচয়

মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল- **১.** নিয়মিত বাহিনী ও **২.** অনিয়মিত বাহিনী।

১. নিয়মিত বাহিনী: পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর সমন্বয়ে বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। সৈন্যবলের ঘাটতি পূরণের জন্য আধা-সামরিক বাহিনী (যেমন পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ) বা যুবকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮টি ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়। এগুলো হচ্ছে এক, দুই, তিন, চার, আট, নয়, দশ, এগার নং ব্যাটালিয়ন। এছাড়া সেক্টর ট্রুপস গড়ে তোলা হয়।

সেক্টর ট্রুপসের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের সেক্টর ট্রুপসে নেয়া হয়। নিয়মিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন নিয়ে ৩টি ব্রিগেড গঠন করা হয়। এই ব্রিগেডগুলো কে ফোর্স, এস ফোর্স ও জেড ফোর্স নামে পরিচিত ছিল। সরকারি পর্যায়ে এদের নামকরণ করা হয় এম.এফ. (মুক্তিফৌজ)। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যরা মাসিক বেতনভাতা ও সেনাবাহিনীর আইন-শৃংখলার আওতাধীন ছিল। নিয়মিত বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮,৬০০ জন। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীও গড়ে তোলে।

২. অনিয়মিত বাহিনী: যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল গণবাহিনী বা এফ.এফ. (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। এই বাহিনীর সদস্যদের দু'সপ্তাহের প্রশিক্ষনের পর একজন কমান্ডারের অধীনে তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। এই বাহিনীর জন্য কোন সামরিক আইন কার্যকর ছিল না। গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের কোন বেতন ভাতা দেয়া হতো না। অনিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার।

উপর্যুক্ত বাহিনীর বাইরে আরো কয়েকটি অনিয়মিত বাহিনী ছিল। মূলত স্থানীয় ভিত্তিতে ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে এইসব গেরিলা বাহিনী গঠিত ছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শেখ ফজলুল হক মণির নিয়ন্ত্রণাধীনে গঠিত হয় মুজিব বাহিনী। এই বাহিনীর সদস্যদের সকলে ছাত্রলীগের সদস্য। মুজিব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৬,০০০। এছাড়া ন্যাপ (মোজাফফর), কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব দলীয় বাহিনী ছিল।

আঞ্চলিক বাহিনী: সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব বাহিনী গড়ে ওঠে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- কাদেরিয়া বাহিনী (টাঙ্গাইল), আফসার ব্যাটালিয়ন (ভালুকা-ময়মনসিংহ), বাতেন বাহিনী (টাঙ্গাইল), হেমায়েত বাহিনী (গোপালগঞ্জ-বরিশাল), হালিম বাহিনী (মানিকগঞ্জ), আকবর বাহিনী (মাগুরা), লতিফ মীর্জা বাহিনী (সিরাজগঞ্জ-পাবনা) ও জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন) উল্লেখযোগ্য। এসব গেরিলা বাহিনীর কর্মকান্ড ছিল ব্যাপক এবং তারাই ছিলেন যুদ্ধের প্রাণ। এই বাহিনীগুলোর সদস্যদের বিপুলসংখ্যক ছিল স্বেচ্ছাসেবক, স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দেশের অভ্যন্তরে জনগণের মনোবল অটুট রাখা, পাকিস্তানি ও তাদের দোসরদের অতর্কিত আক্রমণ পরাস্ত করা ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষবস্তু যেমন- যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করা, যুদ্ধের জন্য লোকবল সংগ্রহ ও তাদের ট্রেনিং প্রদান ছিল এদের প্রধান কাজ। কাগজে-কলমে গেরিলারা সেক্টর কমান্ডার দ্বারা পরিচালিত হলেও বাস্তবে এরা এলাকাভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হতো। বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলার সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ছিল এর ৩-৪ গুণ।

খ. নিয়মিত বাহিনীর গঠন ও রণনীতি

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের পর পর যুদ্ধকে পরিকল্পিত ও সংগঠিত করার জন্য কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি করে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। চীফ-অফ স্টাফ হিসেবে কর্নেল আবদুর রব ও ডেপুটি চীফ হিসেবে স্কোয়াড্রন লিডার এ.কে. খন্দকারকে নিযুক্ত করা হয়। মুজিবনগর সরকারের এই সামরিক বিভাগের অধীনে এপ্রিল মাসেই বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে প্রতিটির জন্য একজন নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সদস্য নিযুক্ত করা হয়। এসব সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর

সঙ্গে দেয়া হয় অনিয়মিত গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী। প্রত্যেকটা সেক্টরকে আবার কয়েকটি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়। এছাড়া গঠিত হয় তিনটি ফোর্স যা জেড ফোর্স, কে ফোর্স ও এস ফোর্স নামে পরিচিত। মেজর জিয়ার (লে. কর্নেল পদোন্নতিপ্রাপ্ত) নেতৃত্বে জুনের প্রথম দিকে প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে গঠিত হয় জেড ফোর্স। লে. কর্নেল শফিউল্লাহর অধিনায়কত্বে মে মাসেই ২য় ইস্ট বেঙ্গল ও ৩ নম্বর সেক্টর নিয়ে গঠিত হয় এস ফোর্স। মে মাসে ৪র্থ, ৯ম ও ১০ম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে গঠিত হয় কে ফোর্স যার অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ। এসব নিয়মিত বাহিনী ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধকালে নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী গড়ে তোলা হয়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী: ১৯৭১ সালের ৯ অক্টোবর ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার জলঢাকায় বাংলাদেশ সরকার এক আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে ৬১ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে দ্বিতীয় লেফটেনেন্ট পদে কমিশন দেয়। এভাবে শুরু হয় সেনাবাহিনীর যাত্রা। এসব অফিসাররা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সেক্টরে যোগ দেওয়ায় যুদ্ধে গতি সঞ্চার হয়।

বিমান বাহিনী: ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকারের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয়। ১৮ জন পাইলট ও ৫০ জন বৈমানিক নিয়ে এ বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। বিমান বাহিনীর অনেক সদস্য স্থল যুদ্ধেও সাফল্যের পরিচয় দেন। ৩ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনী যে সকল আক্রমণ রচনা করেছিল তার প্রথম আক্রমণের কৃতিত্ব বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর। ঢাকা পতনের আগে পর্যন্ত বিমান বাহিনী প্রায় ১২ বার পাকিস্তানি লক্ষবস্তুর ওপর আক্রমণ চালায়।

নৌবাহিনী: মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী হিসাবে নৌবাহিনীও গড়ে তোলা হয়। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে এ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। ৯ নভেম্বর পাকবাহিনীর কাছ থেকে ৬টি দখলকৃত নৌযান নিয়ে প্রথম 'বঙ্গবন্ধু' নৌবহরের উদ্বোধন করা হয়। যুদ্ধের শেষদিকে নৌবাহিনী গঠিত হলেও নৌ-পথে যুদ্ধ পরিচালনার কৃতিত্ব মূলত নৌ-কমান্ডো গেরিলাদের।

গ. অনিয়মিত বাহিনী

রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক বাহিনী ঃ মুজিব বাহিনী

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব ছাড়াই মুজিব বাহিনী বা বিএলএফ গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বাছাই করা তরুণ ও শিক্ষিত কর্মীদের নিয়ে এ বাহিনী গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা ছাড়াও যুদ্ধের নেতৃত্ব যাতে কোন উগ্রপন্থী বা চরমপন্থী দলের হাতে চলে না যায়, সেটাও মুজিব বাহিনীর অন্যতম লক্ষ ছিল। ভারতীয় জেনারেল উবানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেরাদুনে এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মোট চারটি সেক্টরে মুজিব বাহিনী বিভক্ত ছিল। উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টর গঠিত ছিল বৃহত্তর রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, বগুড়া নিয়ে। এর প্রধান ছিলেন সিরাজুল আলম খান। দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টর গঠিত ছিল বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী নিয়ে। এর প্রধান ছিলেন তোফায়েল আহমদ। পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরের প্রধান ছিলেন শেখ মণি। বৃহত্তম চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, ঢাকার অংশবিশেষ নিয়ে এই সেক্টর গঠিত ছিল। কেন্দ্রীয় সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল বৃহত্তর ময়মনসিং, টাঙ্গাইল ও ঢাকা জেলার অংশ। এর প্রধান ছিলেন আবদুর রাজ্জাক।

আঞ্চলিক বাহিনী

কাদেরিয়া বাহিনী: একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অধিকৃত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়ে যে বাহিনী এক অনন্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, সে বাহিনীর নাম কাদেরিয়া বাহিনী। এর অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর নামানুসারে এই বাহিনীর নামকরণ করা হয়। সমগ্র টাঙ্গাইল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা জেলার কিয়দংশসহ মোট ১৫০০ বর্গমাইল এলাকা কাদেরিয়া বাহিনীর আওতাধীন ছিল। কাদেরিয়া বাহিনীতে ১৬,০০০ যোদ্ধা এবং ৭২,০০০ স্বেচ্ছাসেবক ছিল। কাদের সিদ্দিকী ৩০ মাইল এলাকা নিয়ে একটি মুক্তাঞ্চলও গড়ে তোলেন যার সদর দপ্তর ছিল ভুয়াপুর। কাদেরিয়া বাহিনী নিয়মিত বাহিনীর মত গড়ে তোলা হয় এবং এই বাহিনীর সদর দপ্তরকে প্রধানত ৫টি দপ্তরে বিভক্ত করা হয়- **১.** অস্ত্রাগার, **২.** বেসামরিক বিভাগ, **৩.** বেতার ও টেলিফোন, **৪.** হাসপাতাল, **৫.** জেলখানা। বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান ছিলেন আনোয়ার আলম শহীদ।

বাতেন বাহিনী: টাঙ্গাইলের খন্দকার বাতেন মুক্তিযুদ্ধকালে দক্ষিণ টাঙ্গাইল, ঢাকার কিছু এলাকা, গাজীপুর জেলার কিছু এলাকা, মানিকগঞ্জ জেলার উত্তরাঞ্চল, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার কিছু এলাকা নিয়ে বাতেন বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। এ বাহিনীর তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। সামরিক বিভাগ ছাড়াও ছিল বেসামরিক বিভাগ।

আফসার ব্যাটালিয়ন: ময়মনসিংহ জেলার ভালুকার আফসার উদ্দিন ছিলেন আফসার ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠাতা। ৪,৫০০ জন যোদ্ধা নিয়ে এ বাহিনী গঠিত ছিল। এই বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র ছিল ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণাঞ্চল (ভালুকা, গফফরগাঁও, ত্রিশাল, কোতোয়ালী, টাঙ্গাইল জেলার কিয়দংশ), ঢাকা ও গাজীপুর জেলার অংশবিশেষ। মূলত পাকবাহিনীর কাছ থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ছিল এই বাহিনীর অস্ত্র সংগ্রহের উৎস।

হেমায়েত বাহিনী: সৈনিক হেমায়েত উদ্দিন গোপালগঞ্জ, বরিশাল, ফরিদপুর, মাদারীপুর এলাকায় গড়ে তোলেন হেমায়েত বাহিনী। এ বাহিনীর যোদ্ধা সংখ্যা ছিল ৫,০৫৪ জন। নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিলেন ৩৪০ জন, বাকিরা ছিলেন গেরিলা। এ বাহিনীতে বেশ কয়েকজন মহিলা যোদ্ধাও ছিলেন।

আকবর বাহিনী: ঝিনাইদহের গাড়াগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে আকবর বাহিনী যুদ্ধ করে। এর প্রতিষ্ঠাতা আকবর হোসেন মিয়া। এই বাহিনী শ্রীপুর বাহিনী নামেও পরিচিত। এই বাহিনীর অস্ত্র সংগৃহীত হয় পরাজিত পাকিস্তানি হানাদারদের পরাস্ত করে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এই বাহিনীর যুদ্ধ জয়ের খবর অনেকবার প্রচারিত হয়।

লতিফ মির্জা বাহিনী: সিরাজগঞ্জ জেলার কামারগঞ্জ থানাকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধে পলাশ ডাঙ্গা যুব শিবির বা লতিফ মির্জা বাহিনী গড়ে ওঠে। এর পরিচালক ছিলেন আবদুল লতিফ মির্জা। ৭টি রাইফেল ও ১৫ জন যোদ্ধা নিয়ে এ বাহিনীর যাত্রা শুরু এবং এক পর্যায়ে অস্ত্র সংখ্যা ১০ হাজার এবং যোদ্ধা সংখ্যা ৮,০০০ এ উন্নীত হয়। মূলত বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এ বাহিনী যুদ্ধ করে। চলনবিল এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল এই বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি।

হালিম বাহিনী: মানিকগঞ্জে ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী গড়ে তুলেন হালিম বাহিনী। ছত্রিশটি রাইফেল সম্বল করে হরিরামপুরে পদ্মার তীরে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। মানিকগঞ্জ, ঢাকার নবাবগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ছিল তাঁর যুদ্ধ ক্ষেত্র।

অন্যান্য স্থানীয় বাহিনী: এছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে আরো অনেক বাহিনী গড়ে উঠেছিল । যেমন- সুন্দরবন এলাকায় জিয়া বাহিনী, কামালপুর হালুয়াঘাটে আবুল হোসেন ব্যাটালিয়ন, কুদ্দুস মোল্লা বাহিনী, সাহজাহান

বাহিনী, নূর মোহাম্মদ বাহিনী, রফিক বাহিনী, মুজিদ বাহিনী ইত্যাদি। এসব বাহিনীই স্থানীয় পর্যায়ে গেরিলা যুদ্ধে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে।

ঘ. নিয়মিত বাহিনীর কার্যক্রম ও সাফল্য

মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী মূলত সেক্টর ও ব্রিগেডসমূহের আওতায় যুদ্ধ করে। তাদের সঙ্গে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক গেরিলা। যদিও যুদ্ধের মূল নেতৃত্বে ছিলেন নিয়মিত বাহিনীর সদস্যরা। ১ নম্বর সেক্টরে ২৪ মে মুক্তিবাহিনী চাঁদগাজিতে ক্যাপ্টেন অলি আহাদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। ৬ জুন চাঁদগাজি উদ্ধারের চেষ্টা করলেও পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়। তাদের ৭৫ জন সৈন্য নিহত হয়। একই মাসে চাঁদগাজি দখলের পাকিস্তানি উদ্যোগ ব্যর্থ হয় এবং এবার ৪৫ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। যদিও এ মাসের শেষে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে পাকিস্তানি বাহিনী চাঁদগাজী দখল করে নেয়। ক্যাপ্টেন মাহফুজ, ক্যাপ্টেন শামসুল হুদার নেতৃত্বে যথাক্রমে হিয়াকু-রামগড় এবং দেবীপুর বিওপিতে আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী বহু সাফল্য লাভ করে। অক্টোবরে মুক্তিবাহিনী ছাগলনাইয়া, বেলোনিয়া, বল্লমপুর আক্রমণ করে বহু পাকিস্তানি সৈন্যকে হতাহত করে।

২ নম্বর সেক্টরে ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে মুন্সিহাট, ছাগলনাইয়া, বেলুনিয়া যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী সাফল্য লাভ করে। ৮ অক্টোবর মুক্তিবাহিনী শালদা নদী যুদ্ধে জয়লাভ করে। এ মাসে কসবা যুদ্ধেও সাফল্য বয়ে আসে। লে. আজিমের নেতৃত্বে শালদা নদীর যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জয়ী হয়। যদিও নেতৃত্বদানকারী লে. আজিজ শহীদ হন। ৩ নম্বর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে রায়পুর, মাধবপুর, কাপাশিয়া, মনোহরদী, কুলিয়ারচর, তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধ। এসব যুদ্ধেও মুক্তিযোদ্ধারা সাফল্য লাভ করে।

চার নম্বর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ আগস্ট মাসের শাহবাজপুর রেলওয়ে ষ্টেশন যুদ্ধ। পরের মাসে বিয়ানীবাজার, বড়লেখা, জাকিগঞ্জে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী সাফল্য লাভ করে। অক্টোবর মাসে প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই সেক্টরে যোগ দিলে এ বাহিনীর শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। নভেম্বরে আটগ্রাম- জাকিগঞ্জের প্রচন্ড যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জয়ী হন। ৫ম সেক্টরে বড়ছড়া, বালাট, ভোলাগঞ্জে জুলাই-আগস্ট মাসে অসংখ্য যুদ্ধ হয়। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এ সেক্টরের ২০০ বর্গমাইল এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। অক্টোবর মাসে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল এই সেক্টরে যোগ দেয়ার পর মুক্তিবাহিনীর দ্রুত সাফল্য আসতে থাকে।

৬ নম্বর সেক্টরে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে জগদ্দলহাট, ফুলবাড়ী, ভুরুঙ্গামারী, আলীপুর যুদ্ধ। অক্টোবরের মধ্যেই ৬০০ বর্গমাইল এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। ১৮ নভেম্বর জয়মনিরহাট মুক্তিবাহিনী দখল করে। এই যুদ্ধে লে. সামাদ শহীদ হন। ৭ নম্বর সেক্টরে মেজর নাজমুল, ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে আগস্ট মাস পর্যন্ত যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী সাফল্য বয়ে আনে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবলী সারদার যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যদিও যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। নভেম্বর মাসে শাহপুর গড়ের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর, লে. রশিদ, লে. রফিক সাফল্য দেখান। ১৩-১৪ নভেম্বর খানপুর বিওপিতে যুদ্ধে ৩০ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। ৮ নম্বর সেক্টর ক্যাপ্টেন নূরুল হুদার নেতৃত্বে কাশিপুর বিওপির যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জয়ী হয়। জুনে মুজিবনগরে মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ কলারোয়া, বালিয়াডাঙ্গা যুদ্ধ। শেষোক্ত যুদ্ধে ৭২ জন পাকসেনা নিহত হয়।

৯ নম্বর সেক্টরে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ বসন্তপুর বিওপি ও হিংগলগঞ্জ বিওপি যুদ্ধ। নভেম্বর মাসে কালিগঞ্জ যুদ্ধে চল্লিশ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। ১০ নম্বর সেক্টরের যুদ্ধে নৌ-কমান্ডোরা বহু জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।

এসব অভিযানের ফলে সমুদ্র পথে পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য অস্ত্র আনা বন্ধ হয়। তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। ১১ নম্বর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে নালিতাবাড়ি, কোদালকাঠি, চিলমারী, হালুয়াঘাট, কামালপুর যুদ্ধ। কামালপুর যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিগেড যুদ্ধঃ উপর্যুক্ত সেক্টরসমূহের যুদ্ধ ছাড়াও জেড ফোর্স, এস ফোর্স এবং কে ফোর্স দখলদার বাহিনীর সঙ্গে অসংখ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। জেড ফোর্সের অধীনে কামালপুর, বাহাদুরাবাদ ঘাট, কে ফোর্সের অধীনে কসবা, শালদা নদী যুদ্ধ ও বেলোনিয়া যুদ্ধ বিখ্যাত হয়ে আছে। এছাড়া ব্রিগেডের যুদ্ধে ধর্মনগর, মুকুন্দপুর, আখাউড়া, রাধানগর কমপ্লেক্স ও মনতলা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঙ. অনিয়মিত বাহিনীর কার্যক্রম ও সাফল্য

মুজিব বাহিনী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের গেরিলা

মুজিব বাহিনীর প্রায় ছয় হাজার যোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে। যদিও ট্রেনিং শেষে যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায় তারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় তাদের যুদ্ধ বিবরণ তেমন পাওয়া যায় না। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক, দেশের অভ্যন্তরে সেক্টর ও আঞ্চলিক বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবে মুজিব বাহিনীর সঙ্গে এসব বাহিনীর বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘর্ষও হয়। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের কোন কোন জেলায়, চট্টগ্রামে মুজিব বাহিনীর কিছু কিছু কার্যক্রম ও সাফল্য ছিল। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ), ন্যাপ (মোজাফফর), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিংহ) প্রভৃতির যৌথ উদ্যোগে সীমান্ত এলাকাগুলোতে যুব শিবির ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসব শিবিরের কয়েক হাজার গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেয়। ছাত্র ইউনিয়ন সমমনাদের নিয়ে এসব গেরিলা দল গঠন করে যারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে। ১১ নভেম্বর কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বেতিয়ারা রণাঙ্গনে এদের একটি গেরিলা দলের ৭৮ জন দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশকালে পাকবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ৯ জন সদস্য শহীদ হন।

আঞ্চলিক বাহিনী

কাদেরিয়া বাহিনীঃ কাদেরিয়া বাহিনীর সঙ্গে পাকবাহিনীর প্রথম সংঘর্ষ হয় ২২ মে টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে। ১৫ জন পাকিস্তানি সৈন্য এখানে নিহত হয়। তবে কাদেরিয়া বাহিনীর বড় যুদ্ধ মাটিকাটার জাহাজমারা যুদ্ধ। জাহাজে প্রায় ২১ কোটি টাকার অস্ত্র ছিল এবং যুদ্ধে জয়লাভের ফলে প্রায় সব অস্ত্র কাদেরিয়া বহিনীর দখলে আসে। ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর কাদেরিয়া বাহিনী টাঙ্গাইল শত্রুমুক্ত করে ঢাকা অভিমুখে রওয়া হয়। এসময় কাদেরিয়া বাহিনী জামালপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল থেকে পালিয়ে আসা তিন হাজার পাক সৈন্যকে গ্রেফতার করে। ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণকালে কাদেরিয়া বাহিনীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ বাহিনীর ৬ হাজার যোদ্ধা উক্ত অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।

বাতেন বাহিনীঃ ১৯৭১ সালের মে মাসের প্রথম থেকে বাতেন বাহিনী পাকিস্তানি হানাদারদের ওপর আক্রমণ চালায়। এ মাসে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানা, ঘিওর ও দৌলতপুর থানা আক্রমণ করে। এ দু'টি থানা দখল করে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। এ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো মির্জাপুর থানার ধল্লা ব্রিজ অভিযান, সাটুরিয়া থানা, নাগরপুর থানা দখল অভিযান। এসব অভিযানে থানা ও শত্রু বাহিনীর প্রচুর অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। যদিও যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সহযোদ্ধাদের মিস ফায়ারে বাতেন মারা যান।

আফসার ব্যাটালিয়ন: মে মাসের প্রথম দিকে ভালুকা থানা দখল করে ১০টি রাইফেল সম্বল করে যে বাহিনী গঠিত হয় ক্রমান্বয়ে এ বাহিনী একটি সুসজ্জিত বাহিনীতে রূপ নেয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে বহু রাজাকারকে হত্যা করা ছাড়াও মল্লিকবাড়ি পাকসেনাদের ঘাঁটি দখল করে নেয়। কালিগঞ্জ ও ত্রিশাল এলাকা থেকে আসা পাক সেনাদেরও পরাজিত করে। এ যুদ্ধে ৭১ জন পাক সেনা ও রাজাকার নিহত হয়। এ মাসে গফরগাঁও থানায়ও সফল অভিযান পরিচালিত হয়। ৬ ডিসেম্বর গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে পাকবাহিনীর ট্রাকের ওপর আক্রমণ চালিয়ে পাকবাহিনীকে পরাজিত করে। এ মাসের ১৪ তারিখের মধ্যেই গফরগাঁও, ভালুকাসহ ময়মনসিংহের বড় অংশ তারা দখল করে। ১৮ ডিসেম্বর মেজর আফসার তাঁর বাহিনীসহ ঢাকা পৌঁছান।

হেমায়েত বাহিনী: মে মাসেই আনুষ্ঠানিকভাবে হেমায়েত বাহিনী গঠিত হয়। জুন মাসের মধ্যেই কোটালিপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, কালকিনি, টেকেরহাটে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালানো হয়। সেপ্টেম্বরে ১৪ ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধের পর কোটালিপাড়া থানা হেমায়েত বাহিনী দখল করে নেয়। ৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। হেমায়েত বাহিনী বৃহত্তর বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার অনেক এলাকা মুক্ত করে।

আকবর বাহিনী: মে মাসেই আকবর বাহিনীর পাকিস্তানি অবস্থানের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। তবে আগষ্ট মাস থেকে বড় ধরনের অভিযান পরিচালিত হয়। এ মাসে শৈলকুপা থানা দখল ছাড়াও আলফাপুরের যুদ্ধে আকবর বাহিনী প্রচুর অস্ত্র লাভ করে। এ যুদ্ধে ৫৫ জন পাক সেনা নিহত হয়। এ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অভিযান হচ্ছে ইছাখাদা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ, মাশানিয়ার যুদ্ধ, বরইপাড়া যুদ্ধ, বিনোদপুর রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ, নাকোলের যুদ্ধ। ৪ ডিসেম্বর মাগুরা বিজয় এ বাহিনীর অপর সাফল্য বয়ে আনে। ঐ দিন ২৫০ জন পাক সেনাকে নিহত করে আকবর বাহিনী মাগুরা জয় করে। এরপর আকবর বাহিনী ফরিদপুরের দিকে অগ্রসর হয়। মিত্রবাহিনী, আকবর বাহিনী ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফরিদপুর মুক্ত হয়।

লতিফ মির্জা বাহিনী: লতিফ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে কাশিনাথপুরের ডাব বাগানের যুদ্ধ, ঘাটনা যুদ্ধ, ফরিদপুর থানা যুদ্ধ, সাঁথিয়া যুদ্ধ। নাটোরের গুরুদাসপুর থানা আক্রমণ করে এ বাহিনী প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে। পাক সেনাদের শক্ত ঘাঁটি ব্রাহ্মগাছায়ও মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে সাফল্য লাভ করে। আকবর বাহিনী সর্বশেষ যুদ্ধ করে উল্লাপাড়ায়। এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ১৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

হালিম বাহিনী: হালিমবাহিনী মানিকগঞ্জ জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী নাবাবগঞ্জ থানায় বেশ কয়েকটি সাফল্য অভিযান চালান। জুলাই মাসে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র আক্রমণ ও আগস্ট মাসে শিবালয় থানায় আক্রমণ করে ৬০/৭০ জন পাকসেনাকে হত্যা করে ৭০টি রাইফেল উদ্ধার করে। এ মাসেই বানিরটেকে পাকসেনাদের ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। অক্টোবরে হরিরামপুরের সি.ও. অফিস আক্রমন করা হয়। নভেম্বর মাসে মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকে মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা সদর উত্তর-দক্ষিণের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে ক্যাপ্টেন হালিম ব্যাপক তৎপরতা দেখান। এ সময় কিছু সংখ্যক নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলাও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। নভেম্বর মাসেই সাটুরিয়া থানা, শিবালয় থানা এবং পরের মাসে ঘিওর থানা, সিংগাইরে যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে হালিম বাহিনী সাফল্য অর্জন করে। ১৪ ডিসেম্বর হালিম বাহিনীর হাতে মানিকগঞ্জ মুক্ত হয়। পরের দিনই স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মানিকগঞ্জের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ জনতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরিরত সৈন্য, ইপিআর সৈন্য, পুলিশ, আনসার সহ সামরিক, আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরাও এতে যোগ দেন। এভাবে বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত মুক্তিবাহিনীর হাতে বহুগুণ বেশি অস্ত্র নিয়েও পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়। স্বল্প সংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে যোগদানকারী অনিয়মিত গেরিলা বাহিনী, আঞ্চলিক বাহিনী ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক বাহিনীরও ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিপুল সংখ্যক অনিয়মিত বাহিনী কখনো নিয়মিত বাহিনীর নেতৃত্বে, কখনো স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করেছে। তবে যে সেখানেই যুদ্ধ করুন না কেন নির্বিশেষে সকল বাহিনীর লক্ষ ছিল এক ও অভিন্ন আর তা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, নবম ও দশম খন্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪।
২। শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা, বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫।
৩। মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৮৩।
৪। *স্মৃতি* (সংকলন), ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, উৎসের সন্ধানে, ১৯৯১।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন। (ক)

১। মুক্তিযুদ্ধকালে অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নাম ছিল-
(ক) মুজিব বাহিনী (খ) গণবাহিনী
(গ) মুক্তি ফৌজ (ঘ) কাদেরিয়া বাহিনী।

২। আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের সংখ্যা ছিল-
(ক) ৫০ হাজার (খ) লক্ষাধিক
(গ) ২৫ হাজার (ঘ) কোনটা নয়।

৩। কাদেরিয়া বাহিনীর যুদ্ধ এলাকা ছিল মূলত-
(ক) শ্রীপুর (খ) মানিকগঞ্জ
(গ) টাঙ্গাইল (ঘ) সিরাজগঞ্জ।

৪। পলাশডাঙ্গা যুব শিবির কোন আঞ্চলিক বাহিনীর নামের সঙ্গে যুক্ত-
(ক) মির্জা লতিফ বাহিনী (খ) কাদেরিয়া বাহিনী
(গ) আফসার ব্যাটালিয়ন (ঘ) হালিম বাহিনী।

৫। বাংলাদেশের প্রথম নৌবহরের নাম-

(ক) ঈশা খাঁ (খ) মোয়াজ্জেম

(গ) বঙ্গবন্ধু (ঘ) তিতুমীর।

৬। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পনের সময় কোন আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্যরা ঢাকায় উপস্থিত ছিল-

(ক) আফসার ব্যাটালিয়ন (খ) আকবর বাহিনী

(গ) হেমায়েত বাহিনী (ঘ) কাদেরিয়া বাহিনী।

৭। নিয়মিত বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল-

(ক) ১৫,৬০০ (খ) ১৮,৬০০

(গ) ১৭,৬০০ (ঘ) ১৬,৬০০।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। ৫টি আঞ্চলিক বাহিনীর পরিচয় দিন।

২। মুক্তিযুদ্ধকালে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী কখন ও কিভাগে গড়ে উঠেছিল সংক্ষেপে লিখুন।

৩। কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনীর গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে যেসব গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল তাদের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

৫। হেমায়েত ও আকবর বাহিনীর যুদ্ধে কার্যক্রম ও সাফল্য সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। নিয়মিত বাহিনীর পরিচয়, গঠন, কার্যক্রম ও সাফল্যের বিবরণ দিন।

২। অনিয়মিত বাহিনীর পরিচয়, গঠন, কার্যক্রম ও সাফল্যের বিবরণ দিন।

পাঠ-৫

উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *মুক্তিযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল জানতে পারবেন;*
- *১১টি সেক্টরের উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গন ও যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *সেক্টরের বাইরে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক বাহিনীর রণাঙ্গন ও যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।*

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে পাকবাহিনী বাঙালি জাতির ওপর নৃশংস গণহত্যা শুরু করলে শত্রুদের কার্যক্রম প্রতিহত করতে প্রথমই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালি ছাত্র-যুবক-জনতা। পাশাপাশি এগিয়ে এসেছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর-এর বীর যোদ্ধা, আনসার, পুলিশ ও মুজাহিদ সদস্যরা। প্রথমত, ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয়ত, মে মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পরিকল্পিত যুদ্ধ চলে। তৃতীয়ত, ডিসেম্বরের প্রথম থেকে সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত যুদ্ধে পাকবাহিনী পরাজিত হয়। বাংলাদেশ হয় শত্রুমুক্ত।

ক. মুক্তিযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল

সর্বপ্রথম যুদ্ধ শুরু হয় নিয়মিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রথাগত পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলে মে মাস পর্যন্ত। শত্রুকে ছাউনিতে যথাসম্ভব আটকে রাখা এবং যোগাযোগের কেন্দ্রগুলো তাদের কব্জা করতে না দেয়ার জন্য নিয়মিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা কম হওয়ায় মে মাসের শেষ নাগাদ গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নিয়মিত ও গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালানোর ফলে জুন মাস থেকে ব্যাপকভিত্তিক যুদ্ধ চালানো সম্ভব হয়। ভারতীয় বাহিনী ৩ ডিসেম্বর থেকে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার পর গঠিত হয় যৌথবাহিনী। মিত্র ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে যুদ্ধের রণনীতি নির্ধারণ করে। ইতোমধ্যে মুক্তিবাহিনী যেসব এলাকা মুক্ত করেছিল সেখানে মুক্তিবাহিনী নিজস্ব পরিচালনায় কাজ করেছে। এই পরিকল্পনার আওতায় শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটিকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে সামনে ব্যস্ত রেখে পিছনে বা অন্য দিক দিয়ে ধ্বংস করার কৌশল গৃহীত হয়। আর যেখানে অধিক শক্তি ও অস্ত্র প্রয়োজন সেখানে যৌথবাহিনী যুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে ভারতীয় বাহিনী শত্রুর শক্তিশালী জায়গায় চাপ প্রয়োগ করতো ও মুক্তিবাহিনী পার্শ্ববর্তী বা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতো। এভাবে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকবাহিনীকে আটকে রেখে কিংবা ঘাঁটি থেকে বের করে এনে ধ্বংস কিংবা আত্মসমর্পণ করানো হয়।

খ. ১১টি সেক্টরের উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

১ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গন হচ্ছে কুমিরা যুদ্ধ ও মিরশ্বরাই যুদ্ধ।

কুমিরা যুদ্ধঃ কুমিরা চট্টগ্রামের প্রবেশ দ্বার। ফেনী মিরশ্বরাই পার হয়ে এর অবস্থান। কুমিরায় শত্রুর বিরুদ্ধে ইপিআর সেনাদের যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম সরাসরি আক্রমণ। এই যুদ্ধের গুরুত্ব এতটা সুদূরপ্রসারী ছিল যে, এরপর পাকিস্তানি সৈন্যদের চট্টগ্রামে অবাধে কিছু করার মূল পরিকল্পনা ব্যাহত করে দেয়। কুমিরায় আগে থেকে প্রস্তুত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় পাকবাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। দু'ঘন্টা স্থায়ী যুদ্ধে পাকবাহিনী দু'টি ট্রাক রেখে পালিয়ে যায়। শত্রু বাহিনীর দু'জন অফিসারসহ মোট ১৫২ জন সৈনিক নিহত হয়। ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা এ যুদ্ধে শহীদ হন। এরপর যুদ্ধ আরো ৩ দিন চলে। ২৮ মার্চ আরো অধিক সৈন্য এনে তিন দিক থেকে পাকবাহিনী মুক্তিবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ চালায়। কুমিরা ২৮ মার্চ পাকিস্তান বাহিনীর দখলে চলে যায়। কুমিরা পতনের পর হানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হয়। কুমিরা মুক্তিবাহিনী চূড়ান্তভাবে জয় করে ১৬ ডিসেম্বর।

মিরশ্বরাই থানা সদর প্রতিরোধ যুদ্ধঃ মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে চট্টগ্রাম সেনানিবাস ও ইপিআর উইং সদর দপ্তরে পাকবাহিনীর আগমনের ফলে বাঙালি সৈনিকরা ক্যাপ্টেন অলি আহমদের নেতৃত্বে মিরশ্বরাই থানা সদর আশ্রয় নেয় ও ঘাঁটি স্থাপন করেন। ২০ এপ্রিল অনেকগুলো ট্রাক, জীপ নিয়ে পাকবাহিনীর বিরাট একটি দল মুক্তিবাহিনীর অবস্থান আক্রমণ করে। কিন্তু আগে থেকে প্রস্তুত মুক্তিযোদ্ধারা চার দিক থেকে তাদের আক্রমণ করে। সকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত টানা যুদ্ধ চলে। পাকবাহিনীর বেশ কয়েকজন সৈন্য এতে নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর দু'জন বীর যোদ্ধা শহীদ হন। ক্যাপ্টেন অলির ভাষায়, স্বাধীনতার শুরুর পর সম্ভবত এটিই ছিল মুখোমুখি লড়াইয়ে পাকিস্তানিদের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত।

২ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

২ নম্বর সেক্টরে উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গন হচ্ছে শালদা নদী কমপ্লেক্সের যুদ্ধ, বেলোনিয়া যুদ্ধ ও কসবা যুদ্ধ।

শালদা নদী কমপ্লেক্স যুদ্ধঃ ফেনীর শালদা নদী এলাকায় শত্রুদের ঘাঁটি ছিল খুবই শক্তিশালী। এই ঘাঁটির উত্তরে শালদা নদী, পূর্বে রেলওয়ে স্টেশন ও উঁচু রেল লাইন সম্মুখবর্তী এলাকা শত্রুর নিরাপত্তায় প্রাধান্য বিস্তার করে। এছাড়া পশ্চিমের গুদামঘরের উঁচু ভুমি তাদের শাক্তিশালী ঘাঁটি নিরাপত্তায় বেশ সহায়ক ছিল। নদীর তীরে তারা পরিখা খনন করে নিরাপত্তা আরো শক্তিশালী করে। এমনি একটি কৌশলগত এলাকা পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী উভয়ের জন্য জরুরি ছিল। তাই মুক্তিবাহিনী এ এলাকা দখলের জন্য বেশ কয়েকবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১০ জুন সংঘটিত বেলোনিয়ার যুদ্ধে ৩০০ পাক সেনা নিহত হয়। এর বদলা নিতে ১৯ জুলাই পাক সেনাদের একটি দল শালদা নদী দিয়ে পার হওয়ার সময় মুক্তিবাহিনী ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালায়। পাকবাহিনীর কর্নেল কাইয়ুম, কুমিল্লার ত্রাস ক্যাপ্টেন বোখারীসহ মোট ৬০/৭০ জন গুলিতে, কেউবা নদীতে ডুবে প্রাণ হারায়। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুক্তিবাহিনী মন্দভাগ ও শালদা নদীতে আরো শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলে। পাক সেনারা জুলাই মাসের শেষের দিকে শালদা নদী পুনর্দখলের চেষ্টা করে। এবারের সংঘর্ষে ১২০ জন পাক সেনার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা লাভ করে। বিক্ষিপ্তভাবে শালদা নদী এলাকায় যুদ্ধ সম্পূর্ণ জুলাই মাসে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে বেলোনিয়া পাকবাহিনীর দখলে চলে যায়। ক্যাপ্টেন গাফফার, ক্যাপ্টেন সালেকের বাহিনী শালদা নদীর শত্রু অবস্থান সম্পূর্ণ ঘিরে রেখেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে শালদা নদী রেলওয়ে ষ্টেশন এলাকায় পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ হয়। এই স্টেশনের সঙ্গে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা,

ঢাকা ও সিলেটের রেলওয়ে যোগাযোগ ছিল। দুই সপ্তাহ স্থায়ী এ যুদ্ধে শত্রু সেনার বহু ক্ষয়ক্ষতি করে ৮ অক্টোবর শালদা নদী মুক্তিযোদ্ধারা পুন:দখল করে। নভেম্বর মাসে চূড়ান্ত যুদ্ধে শালদা নদী এলাকাসহ ফেনীর একটি এলাকা মুক্ত হয়। ক্যাপ্টেন গাফফার ও সুবেদার বেলায়েত (শহীদ) এই যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং স্বাধীনতার পর 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। শালদা নদী কমপ্লেক্সের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। এসব যুদ্ধে ৮০-৯০ জন শত্রু সেনা নিহত হয়।

বেলোনিয়া যুদ্ধঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বেলোনিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন। ফেনী থেকে ১২ মাইল দূরে সীমান্তবর্তী বেলোনিয়ায় রেল যোগাযোগ রয়েছে। মুক্তিবাহিনী প্রথম থেকেই সীমান্তবর্তী পাক সেনাদের অবস্থানে তাদের ব্যতিব্যস্ত রাখে। মে মাস থেকেই পাকবাহিনী বেলোনিয়া দখলের চেষ্টা চালায়। মুক্তিবাহিনী একদিকে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে বন্দুয়াতে এবং লে. ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে অন্যদিকে প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করে। মুন্সিরহাটেও মুক্তিবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ছিল। বেলোনিয়া থেকে মুন্সিরহাট এই ১২ মাইল এলাকা ছিল পুরোপুরি মুক্ত এলাকা। ১০ জুন প্রথম বেলোনিয়া এলাকায় পাকবাহিনী প্রবেশ করে। ১০ জুন থেকে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করলে মুক্তিবাহিনী তাদের আক্রমণের জবাব দেয়। বান্দুয়া সেতুর যুদ্ধে ৫০ জন পাক সেনা গুলির আঘাতে মারা যায়। গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় আবার মুক্তিবাহিনীর পাতা মাইনের আঘাতে বিপুল পাক সেনা নিহত হয়। জীবিতরা সে যাত্রা পশ্চাদাপসরণ করে। এ যুদ্ধের পর পাকবাহিনীর ৩০০ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পাকবাহিনী এই বিপর্যয়ের প্রতিশোধ নিতে ১৭ জুলাই রাতে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ করে। পাকবাহিনী হেলিকপ্টার ব্যবহার করে মুক্তিবাহিনীকে ঘেরাও করে ফেললে মুক্তিবাহিনী পিছু হটে। ১৮ জুলাই পাকবাহিনীর হাতে বেলোনিয়ার পতন ঘটে। এরপর অক্টোবর মাস পর্যন্ত বেলোনিয়া পাকবাহিনীর দখলে ছিল। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকবাহিনীর এরপর ২ নভেম্বর সংঘর্ষ হয় এবং তা ৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলে। পাকবাহিনী বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করে। একটি বিমান অবশ্য মুক্তিবাহিনী গুলি করে ধ্বংস করে। মুক্তিবাহিনীর চতুর্মুখী হামলায় পাকবাহিনীর শতকরা ৮০ ভাগ সৈন্যই মারা যায়। ৯ নভেম্বর পরশুরাম ও বেলোনিয়া মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে এবং পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ফলে ফেনীর একটি বড় অংশ শত্রুমুক্ত হয়। বেলোনিয়ার এই যুদ্ধ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের স্টাফ কলেজে পড়ানো হয়। ১৯৭৩ সালে বিভিন্ন দেশের ২১ জন জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ার এই রণাঙ্গন পরিদর্শন করতে আসেন।

কসবা যুদ্ধঃ ২ নম্বর সেক্টরের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন কসবা। পাকবাহিনী কসবায় শক্তিশালী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে। সামরিক দিক দিয়ে কসবা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ২২ অক্টোবর ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন কসবা আক্রমণ করেন। সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে গুরুতর আহত হন খালেদ মোশাররফ। এরপর ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জয়ী হয়। কসবা শত্রুমুক্ত হয়।

৩ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ তেলিয়াপাড়া যুদ্ধ, আখাউড়া যুদ্ধ, আশুগঞ্জ যুদ্ধ।

তেলিয়াপাড়া যুদ্ধঃ তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ৩ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল। মে মাসেই পাকবাহিনী ৮/১০ বার এখানে হামলা চালালেও মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বরং মুক্তিবাহিনী পাকবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করে কিছু অস্ত্র উদ্ধার করে। ১৬ মে পাকবাহিনীর ৪০ জন সৈন্য নিহত হয়।

১৯ মে পুনরায় মুক্তিযোদ্ধারা লে. মোরশেদের নেতৃত্বে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করলে বহু পাক সেনা হতাহত হয়। যদিও এই পরাজয়ের পর আরো শক্তি সঞ্চয় করে পাকবাহিনী আক্রমণ করলে ২০ মে মুক্তিবাহিনী অবস্থান পরিবর্তন করে।

আখাউড়া যুদ্ধঃ কৌশলগত কারণে বিশেষ করে রেলওয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আখাউড়া গুরুত্বপূর্ণ। ৩০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আখাউড়ায় পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ কে ফোর্সের প্রধান লে. কর্নেল শফিউল্লাহ স্বয়ং পরিচালনা করেন। মেজর মঈনুলের নেতৃত্বে এ যুদ্ধ তিন দিন চলে। ১ ডিসেম্বর আজমপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের উত্তরাংশ মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। ১-২ ডিসেম্বর পাক সেনারা পল্টন আক্রমণ করে। এরি মধ্যে ৩ ডিসেম্বর ভারত সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পরের দিন মিত্র বাহিনী আখাউড়ায় মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। ৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে আখাউড়ার পাক সেনারা আত্মসমর্পণ করে। আখাউড়া জয়ের ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল সহজ হয়।

আশুগঞ্জ যুদ্ধঃ ৩ নম্বর সেক্টরের অপর গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ আশুগঞ্জ যুদ্ধ। ৮ ডিসেম্বর মেজর ভূঁইয়া ও এস ফোর্সের একটি দল আশুগঞ্জ আসে। এখানে পাকবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল। ১০ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী আশুগঞ্জ প্রবেশ করে। পাকবাহিনী নিশ্চিত পরাজয় জেনে আশুগঞ্জ ব্রিজ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। যৌথ বাহিনী ঐদিনের মতো পিছু হটে। অন্য দিকে পাকবাহিনী আশুগঞ্জ ছেড়ে ভৈরব আশ্রয় নেয়। ভারতীয় বিমান বহরও ভৈরব অবরোধ করে। মুক্তিবাহিনী এতে যোগ দেয়। এভাবে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত পাকবাহিনী ভৈরবে অবরুদ্ধ থাকে।

৪ নম্বর সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গন ছিল শেরপুর, শমসেরনগর, আটগ্রাম ও খাদিমনগর যুদ্ধ।

শমসেরনগর যুদ্ধঃ শমসেরনগরও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এখানে বিমানবন্দর থাকায় এর গুরুত্ব আরো বেশি ছিল। গোটা মৌলভীবাজার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা রয়েছে। ২৬ মার্চ মুক্তিবাহিনী শমসেরনগরের দিকে অগ্রসর হয়। তবে ২৮ মার্চ সমবেত জনতার আক্রমণ জোরালো হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধে ক্যাপ্টেন গোলাম রসুলসহ ৯ জন পাক সেনা নিহত হয়। দু'টো সামরিক জীপসহ বিপুল অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। মৌলভীবাজার থেকে পিছু হটে পাক সেনারা শেরপুর আশ্রয় নেয়। এই যুদ্ধের সাফল্য পরবর্তীকালে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে।

শেরপুর যুদ্ধঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর হিসাবেই নয়, বরং বৃহত্তর সিলেটের চারটি জেলার সংযোগস্থল হচ্ছে শেরপুর। তাই উভয় পক্ষের কাছেই শেরপুর কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। শেরপুর ও সাদীপুরের ওপর ইতোমধ্যে পাকবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ এপ্রিল তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে মুক্তিবাহিনী শেরপুর আক্রমণ করে। ৭ ঘন্টা স্থায়ী এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জয়ী হয়। মুক্তিবাহিনী শেরপুর দখল করে এবং অনেক অস্ত্র হস্তগত করে। এতে মৌলভীবাজার থেকে সিলেট পর্যন্ত বিশাল এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। পাকবাহিনী সিলেট শহর ও সালুটিকর বিমান বন্দরে তাদের কার্যক্রম সীমিত করে দেয়।

আটগ্রাম যুদ্ধঃ ৪ নম্বর সেক্টরের আরো একটি বড় রণাঙ্গন আটগ্রাম। ১০ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকবাহিনীর একটি বড় রকমের সংঘর্ষ হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে আটগ্রাম এবং জাকিগঞ্জ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেক্টর কমান্ডার সি. আর. দত্তের পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন রব এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। ৪০ জনের বেশি পাক সেনা যুদ্ধে নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর অপর একটি দল লে. জহির ও

লে. গিয়াসের নেতৃত্বে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। ভারতীয় বাহিনীও মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে আসে। দীর্ঘদিন ক্রমাগত যুদ্ধের পর ২০/২১ নভেম্বর জাকিগঞ্জ ও আটগ্রাম শত্রুমুক্ত হয়।

খাদিমনগর যুদ্ধঃ খাদিমনগর ছিল পাকিস্তানিদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি। ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী খাদিমনগর পাক ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। উভয়পক্ষের যুদ্ধের পর খাদিমনগর মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে।

৫ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

এ সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে ছাতক যুদ্ধ, রাধানগর যুদ্ধ, রাধানগর কমপ্লেক্স যুদ্ধ।

ছাতক যুদ্ধঃ ছাতক মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে ১৩ অক্টোবর। ঐ রাতেই মুক্তিবাহিনী লড়াই গ্রাম ও সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করে নেয়। ১৪ অক্টোবর পাকিস্তানিদের একটি লঞ্চ ছাতক যাওয়ার সময় মুক্তিবাহিনী ডুবিয়ে দেয়। ৯ জন পাক সেনা এতে নিহত হয়। ১৪টি রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। কিন্তু ঐ রাতেই পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আক্রমণ করলে ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ১৪-১৯ অক্টোবর পর্যন্ত এখানে যুদ্ধ হয়। পাঁচ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধে মোট চার শতাধিক পাকিস্তানি সৈন্য হতাহত হয়।

রাধানগর কমপ্লেক্স যুদ্ধঃ বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে সকল সুদৃঢ় ঘাঁটি ছিল, ডাউকি থেকে পাঁচ মাইল ভিতরে জাফলং চা বাগানের রাধানগর কমপ্লেক্স তাদের অন্যতম। রাধানগরের পিছনে ছোট খাল, তারপর গোয়াইনঘাট, অল্পদূরে অবস্থিত সালুটিকর বিমান বন্দর ও সিলেট শহর। রাধানগর হাইস্কুলকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানিরা চারদিকে শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ২৬ নভেম্বর ক্যাপ্টেন নবী তাঁর দলসহ রাধানগর-গোয়াইনঘাট সড়কে অবস্থান নেন। ঐ রাতে ভারতীয় বাহিনী রাধানগর আক্রমণ করে। এভাবে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়। ২৭ নভেম্বর পুনরায় পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন মেজর শাফায়াত জামিল। এবার যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বিজয় হয়। যদিও এ যুদ্ধে মেজর জামিল গুলিবিদ্ধ হন। ক্যাপ্টেন নবীর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে ৩০ নভেম্বর রাধানগর কমপ্লেক্স মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। এভাবে পাকিস্তানি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি রাধানগরের পতন হয়।

টেংরাটিলা যুদ্ধঃ টেংরাটিলা পাকিস্তানিদের একটি বড় ঘাঁটি ছিল। ৩০ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর একটি দল টেংরাটিলার অদূরে প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করে। ঐদিনই মুক্তিবাহিনী প্রথম গুলি ছুঁড়ে। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী সেখানে পাকবাহিনীকে ঘেরাও করে রাখে। ৫ ডিসেম্বর টেংরাটিলা শত্রুমুক্ত হয়।

৬ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য অপারেশন হল বড়বাড়ি ইউনিয়ন যুদ্ধ, পচাগড়া যুদ্ধ, ভুরুঙ্গামারী যুদ্ধ, রায়গঞ্জ যুদ্ধ।

বড়বাড়ি ইউনিয়নঃ লালমনিরহাট ও তিস্তাঘাটের মধ্যবর্তী বড়বাড়ি ইউনিয়নে পাকবাহিনীর ঘাঁটি ছিল। ১০ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী সন্ধ্যায় এই ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার নিজে ৬০ জন যোদ্ধাসহ এই অভিযান পরিচালনা করেন। এতে ৫ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। এরপর এই

বাহিনী নিয়মিত তিস্তাঘাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ডিসেম্বরের প্রথম দিক পর্যন্ত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের মুখে টিকে থাকতে না পেরে পাকবাহিনী রংপুর সদর দপ্তরে কেন্দ্রীভূত হয়।

পচাগড়া যুদ্ধঃ পচাগড়ে পাকবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ছিল। এখানে পাকবাহিনীর তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়োজিত ছিল। ২৬ নভেম্বর মুক্তি ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পচাগড়া আক্রমণ করে। কিন্তু পাকবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে ১০০ জন ভারতীয় জোয়ান এবং ২২ জন মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়। ২৮ তারিখ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। ২৭ জন পাক সেনাকে জীবন্ত ধরা হয়। প্রচুর অস্ত্র ও ৮টি গাড়ি মুক্তিবাহিনী দখল করে। এই যুদ্ধ বাংলাদেশের ভিতরে যৌথবাহিনীর বৃহৎ যুদ্ধগুলোর মধ্য অন্যতম।

ভুরুঙ্গামারী যুদ্ধঃ ১৩ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাকিস্তান বাহিনীর ঘাঁটি ভুরুঙ্গমারী থানা আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার যোশী ও বাংলাদেশ বাহিনীর সেক্টর কমান্ডার বাশার স্বয়ং। যৌথবাহিনী ভুরুঙ্গামারী মুক্ত করে। কোন পথেই পালাতে না পেরে বহু পাক সৈন্য নিহত হয়।

রায়গঞ্জ যুদ্ধঃ কুড়িগ্রাম মহকুমার রায়গঞ্জ পাকবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ছিল। রায়গঞ্জ ব্রিজের সামনে ২০ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। কমান্ডার লে. সামাদসহ ১৫/২০ জন শহীদ হন। পরের দিন পর্যন্ত তুমুল লড়াই চলে এবং পাকবাহিনী টিকতে না পেরে নাগেশ্বরীতে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে পাকবাহিনীর ৩০০-৫০০ সৈন্য হতাহত হয়। এর ফলে রায়গঞ্জ, আন্ধারীঝাড় মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে।

৭ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গন ছিল ঠনঠনিয়াপাড়া, স্কুলপাড়া যুদ্ধ, কনসাট যুদ্ধ, বেহাইরে যুদ্ধ, বালিয়াডাংগা যুদ্ধ।

ঠনঠনিয়াপাড়াঃ ১৮ জুন দিনাজপুরের ঠনঠনিয়াপাড়ার যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল স্বয়ং অংশ নেন। এখানে পাকবাহিনীর একটি কোম্পানি এবং ঘাঁটি ছিল। এ যুদ্ধে ১৫ জন পাক সেনা নিহত হয়। ঠনঠনিয়া মুক্তিবাহিনী জয় করলেও এখানে অবস্থান না করে মূল ঘাঁটিতে ফিরে যায়।

স্কুলপাড়া যুদ্ধঃ দিনাজপুরের স্কুলপাড়ার কাছে দিয়ে ৩ অক্টোবর পাকবাহিনীর কয়েকটি ট্রাক যাওয়ার সময় মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায়। ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে এ যুদ্ধে ৩০ জন পাক সেনা নিহত হয়। এ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা উদ্ধার করে।

কনসাট যুদ্ধঃ ২৩ আগস্ট মুক্তিবাহিনী কনসাট আক্রমণ করে। চার ঘন্টা স্থায়ী এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী পিছু হটে যায়। ২৬ আগস্ট আবার এখানে সংঘর্ষ হয়। মুক্তিবাহিনীর তীব্র আঘাতে পাকবাহিনী কনসাট ছেড়ে যায়। কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করে পাক সেনারা কনসাটে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ যুদ্ধে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন।

রেহাইচর যুদ্ধঃ ৭ নম্বর সেক্টরের সর্বশেষ বড় যুদ্ধ রেহাইচর যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। ১৩ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপকণ্ঠে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে মহানন্দা নদী পার হয়ে শহরে মুক্তিবাহিনী প্রবেশ করে এবং রেহাইচর এলাকায় পজিশন নেয়। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর শত্রু সেনাদের ব্যাংকার দখল করে নেন। বিজয়ের আনন্দে একাই এগিয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষের একটি অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে সি এন্ড বি ঘাটের ওপর এলে কপালে গুলি লাগলে তিনি

ঘটনাস্থলে শহীদ হন। বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা এরপর চাঁপাইনবাবগঞ্জ দখল করে নেয়। ১৪ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ শত্রুমুক্ত হয়। যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য স্বাধীনতার পর মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে 'বীর শ্রেষ্ঠ' উপাধি দেয়া হয়।

৮ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ কাগজপুকুরিয়া যুদ্ধ, ভাটিয়াপাড়া যুদ্ধ, বালিয়াডাংগা যুদ্ধ, মুজিবনগর যুদ্ধ।

কাগজপুকুরিয়া যুদ্ধঃ এপ্রিলের মাঝামাঝি ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে যশোরের শার্শা থানার বেনাপোলের কাগজপুকুরিয়া নামক স্থানে হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয়। এখানে ৫০০ জন সৈন্য ছিল। ২৪ এপ্রিল পাকবাহিনী এই ঘাঁটি আক্রমণ করে। ৬ ঘন্টা স্থায়ী এ যুদ্ধে ৫০ জন পাক সেনা নিহত হয়। এ যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মহিবুল হক বীরত্বের জন্য 'বীর বিক্রম' উপাধিতে ভূষিত হন। এর ফলে বেনাপোল এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের আধিপত্য বজায় থাকে। এখানে সব সময় বাংলাদেশের পতাকা ওঠানো থাকতো।

বালিয়াডাঙ্গা যুদ্ধঃ সাতক্ষীরায় কলারোয়া থানার বালিয়াডাংগায় ১৬/১৫ সেপ্টেম্বর পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এ যুদ্ধ ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। ক্যাপ্টেন আলম এ যুদ্ধে আহত হন। পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় বালিয়াডাংগা।সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুর এ যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন,'বালিয়াডাংগার যুদ্ধ ছিল যুদ্ধ জগতে এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী সংঘর্ষ।'

মুজিবনগর যুদ্ধঃ ৩ জুন পাকবাহিনী মুক্তিবাহিনীর মুজিবনগরের লাল বাজার সাব-সেক্টর আক্রমণ করে। এযাত্রা পাকবাহিনী এটি দখল করে নেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সুবেদার পাটোয়ারির নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী চারদিক থেকে আক্রমণ চালায়। ২৮ জন পাক সেনা নিহত হয়। এ যুদ্ধের পর পাকবাহিনীর মুজিবনগর ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয়।

ভাটিয়াপাড়া যুদ্ধঃ ১২ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার ভাটিয়াপাড়া থানার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। ১৮ তারিখ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের এই আক্রমণের মুখে ১৫০ জন পাক সেনা ১৮ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন হুদার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

৯ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ শ্যামনগর যুদ্ধ, গোয়ালডাঙ্গা যুদ্ধ, কপিলমুনির যুদ্ধ, কালিগঞ্জ যুদ্ধ।

শ্যামনগর যুদ্ধঃ ২০ আগস্ট শ্যামনগরে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকবাহিনীর যুদ্ধ হয়। শ্যামনগর থানা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও এ যুদ্ধে সুবেদার ইলিয়াস সহ ৮ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

গোয়ালডাঙ্গা যুদ্ধঃ ১৭ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার গোয়ালডাঙ্গায় রাজাকার ও মিলিশিয়া বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ৫০ জন রাজাকার ও মিলিশিয়া নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা ৭০টি রাইফেল উদ্ধার করে।

কপিলমুনির যুদ্ধঃ খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার কপিলমুনিতে রাজাকার ও মিলিশিয়াদের একটি মজবুত ঘাঁটি ছিল। ইতোপূর্বে মুক্তিবাহিনী এই ঘাঁটি আক্রমণে ব্যর্থ হয়। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী

আবারো এ ঘাঁটি আক্রমণ করে। ৭২ ঘন্টা একটানা যুদ্ধের পর এ ঘাঁটির পতন ঘটে। এ যুদ্ধে ১৫২ জন রাজাকার ও ১ জন খানসেনা নিহত হয়। এরপর পাইকগাছা থানার বড় অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।

কালিগঞ্জ যুদ্ধঃ ২০ নভেম্বর কালিগঞ্জে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘর্ষ হয়। ভোর ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত এ যুদ্ধের পর কালিগঞ্জ শত্রুমুক্ত হয়। ৪০ জন পাক সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে।

১০ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল নদীপথ ও সমুদ্র বন্দরগুলো। এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য অভিযান অপারেশন জ্যাকপট, মংলা অভিযান।

অপারেশন জ্যাকপটঃ অপারেশন জ্যাকপট ছিল নৌ-কমান্ডোদের প্রথম অপারেশন। চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া ছিল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। নৌ-কমান্ডোরা জাহাজে মাইন লাগিয়ে ফিরে আসেন। ১৫ আগস্ট রাত ১২টায় মাইন বিস্ফোরণে চট্টগ্রাম বন্দর প্রকম্পিত হয়। ঐ দিন ক্ষতিগ্রস্থ হয় ১০টি জাহাজ ও ২টি গানবোট। চট্টগ্রাম বন্দরের এই নৌঅপারেশনের খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজের সবই ছিল বিদেশী।

মংলা অভিযানঃ ১৫ আগস্ট পরিচালিত নৌ-কমান্ডোদের মংলা অভিযানে ৪৮ জন কমান্ডো অংশ নেন। মাইন লাগিয়ে তারা ফিরে আসেন তীরে। এ অভিযানে সমুদ্রগামী ৫টি জাহাজ ধ্বংস করা হয়। এছাড়া নৌ-কমান্ডোরা ৯ নম্বর সেক্টরেও কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

১১ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ চিলমারী যুদ্ধ, কামালপুর যুদ্ধ।

কামালপুর যুদ্ধঃ কামালপুর ছিল উত্তর সীমান্তে পাকবাহিনীর সুরক্ষিত ঘাঁটি। এই ঘাঁটির সমস্ত ব্যাংকার ছিল সিমেন্টের আরসিসি ব্যাংকার। কামালপুরকে শক্ত করে তৈরির কারণ এর সাথে বক্সিগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, মধুপুর হয়ে ঢাকা পর্যন্ত যোগাযোগ রয়েছে। পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মনে করতো কামালপুরের পতন হলে সাত দিনের মধ্যে ঢাকার পতন হবে। জুলাই মাস থেকে মুক্তিবাহিনী কামালপুরে অভিযান চালায়। ৩১ জুলাই-এর অভিযানে মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন শহীদ হন। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ৬১ জন শহীদ হন। পাকবাহিনীর ৭০ জন সৈন্য নিহত হয়। সেদিন কামালপুর দখল অভিযান ব্যর্থ হয়। আগস্ট মাসে ২ বার মুক্তিযোদ্ধারা কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করে। ১০ সেপ্টেম্বর পুনরায় কামালপুর ঘাঁটির বাইরে যুদ্ধ হয়। এর ফলে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কামালপুর ঘাঁটি সম্পূর্ণ অবরোধ করা সম্ভব হয়। ১৩ নভেম্বর পুনরায় বড় ধরনের যুদ্ধ হয় কামালপুরে। স্বয়ং সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেলতাহের এতে অংশ নেন। ১৫ নভেম্বর এখানে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় এবং কর্নেল তাহের গুরুতর আহত হন। তাঁর অবর্তমানে নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন আজিজ। ২৩ নভেম্বর কামালপুর পুনরায় অবরোধ করা হয়। এখানে ২২০ জন পাক সেনা ও প্রচুর অস্ত্রসহ ৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

চিলমারী যুদ্ধঃ সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে চিলমারী আক্রমণ করে। এখানে পাকিস্তানিদের দু'টি কোম্পানী ছিল। উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকবাহিনীর ১০০ জন নিহত হয়।

গ. আঞ্চলিক বাহিনীর রণাঙ্গন ও যুদ্ধ

সেক্টরের বাইরে আঞ্চলিক বাহিনীও বিভিন্ন গেরিলা যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে।

কাদেরিয়া বাহিনীর রণাঙ্গনঃ কাদেরিয়া বাহিনীর যুদ্ধের মধ্যে ১২ আগস্টে মাটিকাটার জাহাজমারা যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। টাঙ্গাইলের কালিহাতি থানার চারান গ্রামের এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর ১৫ জন সেনা নিহত হয়। অনেক টাকার অস্ত্রশস্ত্র কাদেরিয়া বাহিনীর হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে কাদেরিয়া বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি পায়। ছয়ঘন্টা ধরে এই জাহাজের অস্ত্র খালাস করা হয়। এই অস্ত্র দিয়েই কাদেরিয়া বাহিনী গড়ে তোলা হয়। কাদেরিয়া বাহিনীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হচ্ছে-ধলাপাড়া যুদ্ধ, পাথরঘাটা যুদ্ধ।

আকবর বাহিনীর রণাঙ্গনঃ আকবর বাহিনীর বড় অভিযানের অন্যতম ছিল শৈলকুপা থানা দখল। ৫ আগস্ট আকবরের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল থানা আক্রমণ করে। উভয় পক্ষের যুদ্ধে অবশেষে ১১ জন রাজাকার, পনেরজন পুলিশ গ্রেপ্তার হয়। মুক্তিবাহিনী ৫৭টি রাইফেল লাভ করে। এছাড়া এ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য রণাঙ্গন আলফাপুর যুদ্ধ, খামারপাড়া যুদ্ধ ও মাগুরা যুদ্ধ।

আফসার ব্যাটালিয়নঃ ২ মে আফসার তাঁর বাহিনীসহ ভালুকা থানা আক্রমণ করেন। সেখান থেকে প্রচুর অস্ত্র পান যা তাঁর ব্যাটালিয়ন গঠনে সহায়ক হয়। এ যুদ্ধে অনেক পাক সৈন্য নিহত হয়। আফসার বাহিনীর আরো কয়েকটি রণাঙ্গন হলো মল্লিকবাড়ি বাজারের ঘাট লড়াই, গফরগাঁও থানা যুদ্ধ ইত্যাদি।

হেমায়েত বাহিনীঃ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর ২ তারিখে হেমায়েত বাহিনী কোটালীপাড়া থানার পুলিশ ও রাজাকারদের ওপর আক্রমণ চালায়। ৩ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ১২০ জন পুলিশ ও রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা ১২৭টি রাইফেল উদ্ধার করে।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে প্রতিরোধ করতে প্রাথমিকভাবে বিক্ষিপ্তভাবে যে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে তাই মে মাস থেকে পরিকল্পিত যুদ্ধে রূপ নেয়। আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, অতর্কিত হামলা ও সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা অবস্থানকে দূর্ভেদ্য করতে মুক্তিবাহিনী দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করেছে। রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধারা। সেক্টর ও সেক্টরের বাইরে এসব রণাঙ্গনে অসীম বীরত্ব, সাহসিকতা, পরিশেষে বীরগাঁথায় ভরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, নবম ও দশম খন্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪।

২। মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৭১।
৩। মোঃ খলিলুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ ও নৌ-কমান্ডো অভিযান*, ঢাকা, শিরীন রহমান, ১৯৯৭।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ক্যাপ্টেন গাফফার ও সুবেদার বেলায়েত যে যুদ্ধে অপরিসীম কৃতিত্বের জন্য 'বীরউত্তম' খেতাবে ভূষিত হন সেই যুদ্ধের নাম-
(ক) বেলোনিয়া (খ) শালদা
(গ) কামালপুর (ঘ) কসবা।

২। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের স্টাফ কলেজে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ২ নম্বর সেক্টরের যুদ্ধের নাম-
(ক) শালদা নদী যুদ্ধ (খ) কসবা যুদ্ধ
(গ) আখাউড়া যুদ্ধ (ঘ) বেলোনিয়া যুদ্ধ।

৩। লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ আহত হল-
(ক) কসবা যুদ্ধে (খ) বেলোনিয়া যুদ্ধে
(গ) তেলিয়াপাড়া যুদ্ধে (ঘ) শালদা নদী যুদ্ধে।

৪। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধি পান যে যুদ্ধে অবদান রেখে সেই যুদ্ধের নাম-
(ক) রেহাইচর যুদ্ধ (খ) কনসাট যুদ্ধ
(গ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ যুদ্ধ (ঘ) কাগজপুকুরিয়া যুদ্ধ।

৫। নৌ-কমান্ডোদের সর্বপ্রথম অপারেশনের নাম-
(ক) অপারেশন এন্টারপ্রাইজ (খ) অপারেশন ঈগল
(গ) অপারেশন জ্যাকপট (ঘ) অপারেশন সীএ্যাঞ্জেলস।

৬। কর্নেল তাহের আহত হন-
(ক) চিলমারী যুদ্ধে (খ) কামালপুর যুদ্ধে
(গ) আখাউড়া যুদ্ধে (ঘ) শালদা নদীর যুদ্ধে।

৭। মাটিকাটার জাহাজমারা যুদ্ধ হয়-
(ক) চট্টগ্রাম বন্দরে (খ) মংলা বন্দরে
(গ) চালনা বন্দরে (ঘ) টাঙ্গাইলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। ১ নম্বর সেক্টরের দু'টি রণাঙ্গনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২। শালদা নদীর যুদ্ধ ও বেলোনিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩। ৭ নম্বর সেক্টরের ২টি রণাঙ্গনের বর্ণনা দিন।
৪। কামালপুর যুদ্ধ সংক্ষেপে পর্যালোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। মুক্তিযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশলের বিবরণ দিন। ১১টি সেক্টরের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-৬

বীর শ্রেষ্ঠ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- *মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *৭ জন বীর শ্রেষ্ঠের কর্মজীবনের বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান, যুদ্ধে অসামান্য অবদানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন। পাশাপাশি তাঁদের শহীদ হওয়ার ঘটনা জানতে পারবেন।*

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর গণহত্যা চালায়। সূচনা হয় মুক্তিযুদ্ধের। বাঙালি জাতি হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে। দেশের স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে আত্মাহুতি দিতে হয়। শহীদ হন বহু নিরীহ বাঙালি ও সাহসী যোদ্ধা। যাঁরা যুদ্ধ করেছেন সকলেই যুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তবে ১৯৭৩ সালে সরকার মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ত্যাগ, অবদান ও বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার জন্য ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করে। পরবর্তীকালে আরো মুক্তিযোদ্ধাকে খেতাব দেয়া হয়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ খেতাব হচ্ছে 'বীর শ্রেষ্ঠ'।

ক. খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযোদ্ধাদের ৪ ধরনের খেতাব দেয়া হয়। যেমন- বীর শ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম এবং বীর প্রতীক। এর মধ্যে ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ, ৬৮ জন বীর উত্তম, ১৭৫ জন বীর বিক্রম এবং ৪২৬ জন বীর প্রতীক খেতাব পান। এর মধ্যে ২৮৬ জন আবার সেনাবাহিনী, ২১ জন নৌবাহিনী, ২১ জন বিমান বাহিনী, ১৪১ জন বিডিআর, ৫ জন পুলিশ এবং ২০২ জন ছাত্র, জনতা ও অন্যান্য পেশার গণবাহিনীর সদস্য। এ যাবত যে ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হন তাঁরা হলেন-ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ, ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ, ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন, সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান এবং সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান।

খ. বীর শ্রেষ্ঠদের কর্মজীবন

নূর মোহাম্মদ শেখ: নূর মোহাম্মদ শেখ নড়াইল জেলার মহেশখালী গ্রামের মোহাম্মদ আমানত শেখের একমাত্র পুত্র। তাঁর জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। তিনি স্কুল পর্যায়ে পড়াশোনা করেন এবং ১৯৫৮

সালে ২৩ বছর বয়সে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এ যোগ দেন। বর্তমানে এই বাহিনীর নাম বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)। দিনাজপুরে তাঁর প্রথম পোস্টিং হয় এবং ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে কর্মরত ছিলেন। পরে বদলি হন যশোর। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে ছিলেন।

মুন্সী আবদুর রউফ: ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার সালামতপুর গ্রামে ১৯৪৩ সালের মে মাসে আবদুর রউফ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মুন্সী মেহেদী। অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করার সময় ১৯৬৩ সালে ইপিআর-এ যোগ দেন। ঢাকার পিলখানায় প্রশিক্ষণ শেষে মেশিনগান বিভাগে যোগ দেন।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর: মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জের আবদুল মোতালেব হাওলাদারের ছেলে। আই.এস.সি. পাশের পর ১৯৬৭ সালে সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন।

মোহাম্মদ রুহুল আমিন: নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়িতে ১৯৩৫ সালে তাঁর জন্ম। পিতার নাম আজহার পাটোয়ারী। ১৯৫৩ সালে জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নৌবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৬৮ সাল থেকে চট্টগ্রামে নৌ-ঘাঁটিতে কর্মরত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল: ১৯৪৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর বরিশাল জেলার (বর্তমান ভোলা) দৌলতখান থানার পশ্চিম হাজীগঞ্জ গ্রামে জন্ম। তাঁর বাবা হাবিবুর রহমান ছিলেন সৈনিক। সৈনিক জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কুমিল্লা সেনানিবাসে কাটান। সৈনিক জীবনের শৃংখলা ও সুন্দর পরিবেশ মোস্তফা কামালকে সেনাবাহিনীতে যোগদানে আকর্ষণ করে। ১৯৬৭ সালে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ভর্তি হন। কুমিল্লা সেনানিবাসে পোস্টিং হয় এবং মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি সেখানেই ছিলেন।

মতিউর রহমান: নরসিংদী জেলার রায়পুর থানার রামনগরে ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আবদুস সামাদ। ১৯৬১ সালে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানে পোস্টিং হয়। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ছুটিতে এসে মার্চের প্রথম দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে চাকরিস্থলে ফিরে যান।

হামিদুর রহমান: যশোর জেলার খোরদা খালিশপুরে ১৯৫৩ সালে হামিদুর রহমানের জন্ম। তাঁর বাবা আক্কাস আলী মন্ডল। ১৯৭১ সালে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি চট্টগ্রামে ট্রেনিংরত ছিলেন।

গ. বীর শ্রেষ্ঠদের মুক্তিযুদ্ধে অবদান

বীর শ্রেষ্ঠদের সকলেই ছিলেন অকুতোভয় যোদ্ধা। তাঁরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে দেশমাতৃকার মুক্তি এনেছিলেন।

নূর মোহাম্মদ শেখ: ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির ওপর নৃশংস গণহত্যা শুরু হলে নূর মোহাম্মদ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ৮ নম্বর সেক্টরের অধীন যশোরে যুদ্ধে যোগ দেন। নূর মোহাম্মদকে অধিনায়ক করে গোয়ালহাটি গ্রামে স্থায়ী টহল ক্যাম্প খোলা হয়। তাঁর সঙ্গে নিয়োজিত ছিলেন আরো দু'জন সৈনিক। এ দল ৫ সেপ্টেম্বর টহলরত অবস্থায় পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের শিকার হন। হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুর গুলিতে গুরুতর আহত হয়েও নূর মোহাম্মদ যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু শত্রুর বেয়নেট চার্জে তিনি শেষপর্যন্ত নিহত হন। এই বীর যোদ্ধার চোখ দু'টি পর্যন্ত পাক সেনারা

উপড়ে ফেলে। নূর মোহাম্মদ তাঁর নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে তাঁর দু'জন সহযোদ্ধাদের প্রাণ বাঁচান এবং সহযোদ্ধাদের নিরাপদে চলে যেতে সাহায্য করেন।

মুন্সী আবদুর রউফ: মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকরিরত রউফ সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেন। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রাঙ্গামাটি মহালছড়ি ঘাঁটি রক্ষার দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। ৮ এপ্রিল বুড়িঘাট এলাকায় প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে শত্রু বাহিনীর সংগে যুদ্ধ হয়। শত্রু সেনাদের ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসা মেশিনগানের গুলির সামনে তিনি শেষপর্যন্ত একাই লড়ে যান। তাঁর বাহিনীর সেই অভিযানে শত্রুদের ৭টি স্পীড বোট ডুবে যায় ও আরোহী পাক সেনারা আহত হয়। কিন্তু পরে দু'টি লঞ্চে করে আসা পাক সেনাদের গুলির সামনে রউফ টিকতে পারেন নি। কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লড়াই করেন।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর: ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর পাকিস্তানে কর্মরত অবস্থায় দেশমাতৃকার টানে পালিয়ে এসে জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে ৭ নম্বর সেক্টরে মেহেদিপুরে যোগ দেন। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি সাফল্যজনকভাবে নেতৃত্ব দেন। ডিসেম্বরের ১০ তারিখে ৫০ জন যোদ্ধা নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারঘনিয়ায় অবস্থান নেন। একটানা যুদ্ধ করে ১৪ ডিসেম্বর শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ ও হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। তাঁর নেতৃত্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শত্রুমুক্ত হয়। কিন্তু এই মুক্তির বিনিময়ে বীর যোদ্ধা জাহাঙ্গীর শহীদ হন। তাঁর মরদেহ ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

মোহাম্মদ রুহুল আমিন: চট্টগ্রামে কর্মরত অবস্থায় এপ্রিলে পালিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ২ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধে অসামান্য সাফল্য দেখান। সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠিত হলে তিনি পলাশ জাহাজের ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার হিসাবে যোগ দেন। ৬ ডিসেম্বর থেকে বেশ কয়েকটি নৌ-যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। ১০ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধে খুলনায় পাকিস্তানি বাহিনী রুহুল আমিনের জাহাজ পলাশ আক্রমণ করে। অধিনায়কের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের নির্দেশ অমান্য করে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং শহীদ হন। জাহাজ ত্যাগ করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন বাঁচানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রুহুল আমিন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে জীবন উৎসর্গকেই বেছে নেন।

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল: মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মোস্তফা কামাল যোগ দেন। ১৪ এপ্রিল পাকবাহিনী হেলিকপ্টার, গানশীপ ও নেভাল গানবোট দিয়ে আশুগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটি আক্রমণ করলে ন'ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। এ যুদ্ধের পর তাঁকে সেকশন কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। ১৬ এপ্রিল পুনরায় শত্রু বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। পাকিস্তানি হানাদারদের ভারি অস্ত্রের মোকাবেলায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর গোলায় তিনি শহীদ হন।

মতিউর রহমান: মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে পাকিস্তানে থাকাকালে তিনি যুদ্ধে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বৈমানিক মতিউর জুলাই মাসে পিআইএ-এর একটি বোয়িং বিমানসহ দেশে আসার পথে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ২০ আগস্ট সিন্ধু প্রদেশের মরু অঞ্চলে শহীদ হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রবল আকাংখা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত তা পূরণ না হলেও তাঁর বিমান দখলের চাঞ্চল্যকর ঘটনা পাকিস্তান বিমান বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ এই ভূমিকার কথা বিবেচনা করেই তাঁকে বীর শ্রেষ্ঠ খেতাব দেয়া হয়।

হামিদুর রহমান: ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার মাত্র এক মাস পর যুদ্ধ শুরু হলে তরুণ হামিদুর শ্রীমঙ্গলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ২৭ অক্টোবর শ্রীমঙ্গলের কাছে সীমান্ত চৌকির কাছাকাছি কর্মরত ছিলেন। ধলাই সীমান্ত চৌকি তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘিরে রেখেছিল। হামিদুর রহমান হামাগুড়ি

দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন শত্রুর ঘাঁটির দিকে। একটি হালকা মেশিনগান নিয়ে এগিয়ে যান এবং কয়েকজন পাক সেনাকে ঘায়েল করেন। কিন্তু শত্রুর একটি গুলিতে ২৮ অক্টোবর তিনি শহীদ হন।

সারসংক্ষেপ

৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের জীবন উৎর্গ করে দেশ স্বাধীন করেন। সকলেই সম্মুখ যুদ্ধে জীবনের শেষ সময়ে লড়াই করেছেন কিন্তু পিছনে হটে যান নি। মতিউর রহমান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের বিমান গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বিমান হাইজ্যাক করে দেশে আসার চেষ্টা করেছেন। সফল না হলেও তাঁর আত্মত্যাগ সফল হয়েছে। আমরা শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছি। বীরশ্রেষ্ঠরা মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সন্তান। বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের কোন মৃত্যু নেই। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁদের নাম লেখা থাকবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। জাহানারা ইমাম, *বীরশ্রেষ্ঠ*, ঢাকা, গণ প্রকাশনী।

২। আমীরুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *শত মুক্তিযোদ্ধার কথা*, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্বাধীনতার পর খেতাবপ্রাপ্ত মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা-

(ক) ৫৭৬ জন (খ) ৭৭৬ জন

(গ) ৬৭৬ জন (ঘ) ৮৭৬ জন।

২। মুক্তিযুদ্ধে বীর শ্রেষ্ঠ উপাধি পান মোট-

(ক) ৪ জন (খ) ৭ জন

(গ) ৯ জন (ঘ) ১১ জন।

৩। বাংলাদেশের বাইরে শহীদ হয়েও যিনি দেশপ্রেমের জন্য বীর শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করেন তিনি হলেন-

(ক) মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল (খ) মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

(গ) মোহাম্মদ রুহুল আমিন (ঘ) মতিউর রহমান।

৪। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য উপাধি দেয়া হয়-

(ক) ৩ ধরনের (খ) ৪ ধরনের

(গ) ৫ ধরনের (ঘ) ৬ ধরনের।

৫। বীর শ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর শহীদ হন-

(ক) চট্টগ্রাম (খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জে

(গ) মহালছড়ি (ঘ) আশুগঞ্জ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য যেসব উপাধি দেয়া হয় তার পরিচয় দিন।

২। বীরশ্রেষ্ঠদের যেকোন ৪ জনের কর্মময় জীবন লিখুন।

৩। বীরশ্রেষ্ঠদের যে কোন ৩ জনের মুক্তিযুদ্ধে অবদান আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। বীরশ্রেষ্ঠদের কর্মজীবন ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানসহ বিস্তারিত জীবনী লিখুন।

পাঠ-৭

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *কারা সাধারণত বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত তা জানতে পারবেন;*
- *মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন;*
- *বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের কারণ নির্ণয় করতে পারবেন;*
- *বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শহীদ বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;*
- *বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের ফলে দেশে প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।*

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টি এবং নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল অপরিসীম। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই মুসলিম লীগের পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের বদলে বাঙালিরা ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়। আর এর পেছনে মূল প্রেরণা যোগান ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। তাঁরা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে ষাটের দশকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় ভূমিকা ছিল। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মূল লক্ষবস্তু। যদিও নয় মাস শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নয়, সমগ্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের আক্রোশ ছিল এবং এ কারণে পরিকল্পিতভাবে এ সম্প্রদায়কে নিধনের সিদ্ধান্ত নেয়। অনেকাংশে তারা সফলও হয়। যদিও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় তাদের পরিকল্পনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি।

ক. বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা

যেকোন দেশে চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে অগ্রসর শ্রেণী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। সাধারণ অর্থে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আমলা, কূটনীতিবিদ, বিজ্ঞানী- যারা বিভিন্ন বুদ্ধিভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত তাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়। কোন কোন মনীষী মনে করেন একটি মানুষের দেহের জন্য মস্তিষ্কের যেমন গুরুত্ব, সমাজের জন্য বুদ্ধিজীবীগণ তেমনি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। তাঁরাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। অন্যায়- অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের লেখালেখি, বক্তব্য হয়ে ওঠে প্রতিবাদের দাবানল। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আপামর জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে, মুক্তির লক্ষে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধে যথার্থ ভূমিকাই রেখেছিলেন।

খ. মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, দীর্ঘকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যেসব বুদ্ধিজীবী জড়িত ছিলেন তারাও যেমন মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রাথমিক পর্যায়ে জড়িত ছিলেন না তারাও এক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। অবশ্য বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা শুধু যুদ্ধের নয় মাসেই সীমিত ছিল না। ব্রিটিশ আমলে পরাধীনতার বিরুদ্ধে, পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের প্রতিটি সংগ্রামে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে এরা ছিলেন অনুপ্রেরণাদানকারী, কেউ কেউ সামনের কাতারে। বাঙালি জাতির ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, অত্যাচারের বিষয় সাধারণ মানুষকে অবগত করেছিলেন তাঁরা। বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ যে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে এটা সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা সেই সত্যটা আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তাঁরাই প্রথম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দু'টি স্বতন্ত্র অর্থনীতি চালুর কথা বলেছেন। বাঙালি সাংবাদিকরা তুলে ধরেছেন আন্দোলনের প্রতিটি খবর, শিল্পী-সাহিত্যিকরা গল্প-উপন্যাস, নাটক, গান সহ লেখনীর মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক, মৌলিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের প্রতি সচেতন করে তুলেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কখনো স্বতন্ত্র, কখনো একই সাথে করেছেন আন্দোলন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন বুদ্ধিজীবীরা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় বাঙালি আইনজীবীরা কৌশলে সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে আসামীদের জবানীতে বের করে এনেছেন পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈষম্য ও শোষণের চিত্র, পত্রিকাগুলো সেগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে গণসচেতনা সৃষ্টি করেছে। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রদের বাঁচাতে গিয়ে নিজেই পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা। তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কার্ফু ভঙ্গ করে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। কেউ তাদের বলেনি বের হয়ে আসতে, ড. জোহাকে তারা জানে না, বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাকুক, কোন বিদ্যালয়েই যায়নি তাদের অধিকাংশ মানুষ। কিন্তু ড. জোহার আত্মত্যাগে প্রেরণা লাভকারী মানুষের স্রোতে সেদিন আইয়ুব-মোনায়েমের পতন ঘটেছিল।

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে একইভাবে স্বৈরশাসন কায়েম করলে একইভাবে বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ জানান। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন কালীন সময়ে তারা রাজনীতিবিদ ও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে থেকে কাজ করেন। ১৯৭১ সালে যখন গণহত্যা শুরু হয় তখন বাংলাদেশের মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি মর্মান্তিকভাবে বেজেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকান্ড। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে ছিল এ ঘটনার পর নিশ্চিত জেনেছে যে পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোন বাঙালির বাঁচার উপায় নেই। বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশ তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ভারতে আশ্রয় নেয়া বুদ্ধিজীবীরা গড়ে তুলেন 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' যার সভাপতি ছিলেন ড. আজিজুর রহমান মল্লিক (ভি.সি. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)। এছাড়া তাঁকে সভাপতি এবং জহির রায়হানকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় 'বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম পরিষদ'। বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেল গঠন করেন। বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সরবরাহ ও বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, সংসদীয় পার্টির সঙ্গে সাক্ষাৎ, সাহায্যের আবেদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য প্রদান, শরণার্থীদের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে

তাঁরা ভূমিকা রাখেন। শরণার্থী শিবির শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে ৫৬টি স্কুল খুলে শরণার্থীদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' যা বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামীদের প্রেরণার উৎস ছিল। এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন।

গ. বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের কারণ

মনীষী গোর্কি বলেছেন, মাছের যেমন পচন শুরু হয় মাথা থেকে, তেমনি কোনো জাতিরও অধঃপতনের সূত্রপাত হয় মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি একটি জাতির সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তাকে উৎখাত করে নিজেদের শোষণ ও শাসন চিরস্থায়ী করার জন্য এই মনীষীর বাক্যকেই ঘৃণ্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। তারা একদিকে বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য এবং অন্যদিকে এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, আইনজীবী, রাজনৈতিক প্রভৃতি শ্রেণীকে পঙ্গু ও নির্জীব করার জন্য কোথাও জেল-জুলুম ও হয়রানি চালায়। লোভ-লালসাও দেখানো হয়। এই জালে বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ ধরা দিলেও বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশই ছিলেন জনগণের পাশে। কখনো পেছন থেকে কখনোবা প্রকাশ্যে তাঁরা স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়েছেন। বুদ্ধিজীবীদের এই ভূমিকার কারণে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতার ফলে পাকিস্তান সরকারের ধারণা হয় যে, মূলত বুদ্ধিজীবীদের উস্কানিতেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা চেয়েছে। তাই ২৫ মার্চ গণহত্যার সূচনা হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-ছাত্রীরা এর প্রথম আক্রমণের শিকার হন। ঢাকার জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হলে প্রায় ৫০০ ছাত্র হত্যা করে এবং গণহত্যার শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক নিহত হন। এই হত্যাযজ্ঞ এরপর বাংলাদেশের সর্বত্রই চালানো হয়। প্রধান প্রধান শহরগুলোতে, বিশেষত যেসব জায়গায় পাকিস্তানি সেনানিবাস ও সৈন্য ঘাঁটি ছিলো সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নির্মূল অভিযান চালায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ডিসেম্বরে বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাঙালি জাতিকে স্থায়ীভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পঙ্গু করতে বেছে বেছে বুদ্ধিজীবী হত্যা করে। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিকে স্থায়ীভাবে পরাধীন রেখে শোষণ অব্যাহত রাখা।

ঘ. বুদ্ধিজীবী হত্যার বিভিন্ন পর্যায়

সারা দেশে বুদ্ধিজীবী নির্মূল অভিযানের নীলনক্সা 'অপারেশন সার্চলাইট' অনুযায়ী একযোগে গণহত্যা পরিকল্পনা নেয়া হয়। বুদ্ধিজীবী নির্মূল অভিযানকে ৩ পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলে। প্রথম পর্বে হত্যার শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও দেশের কয়েকজন খ্যাতিমান আইনজীবী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী, রাজনীতিবিদ। তাঁরা শহীদ হন প্রধানত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার অংশ হিসেবে। দ্বিতীয় পর্ব চলে মে-নভেম্বর মাস পর্যন্ত। এ পর্বে প্রকাশ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড কম হলেও গোপনে পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের সহযোগিতায় বুদ্ধিজীবী নিধন চলে। বুদ্ধিজীবীদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের ওপর গোপন কঠোর দৃষ্টি রাখা

হয়। বাঙালি সংস্কৃতিমনা বুদ্ধিজীবীদের তালিকা গণআন্দোলনের সময়ই প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ পর্বে তাঁদের হত্যার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজাকারদের উদ্ধারকৃত ডায়েরি থেকে বুদ্ধিজীবীদের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট হয় বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বাঙালিকে পঙ্গু করাই ছিল হত্যার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের চূড়ান্ত পর্ব ছিল ১০ ডিসেম্বর থেকে চূড়ান্ত বিজয়ের আগে পর্যন্ত। হানাদাররা পরাভূত হবে কিংবা মাত্র ৯ মাসের মধ্যে তাদের ভরাডুবি হবে একথা কল্পনাও করেনি। সেজন্য পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলেও বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথ আক্রমণের মুখেও তাদের টনক নড়েনি। কারণ তখনও মার্কিন সপ্তম নৌবহরের আগমন তাদের শেষ ভরসা ছিল। কিন্তু জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক ফোরামে যুদ্ধবিরতির পক্ষে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেলে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরাজয় নিশ্চিত জেনে আলবদর ও রাজাকার বাহিনীর সহযোগিতায় ১০ ডিসেম্বর থেকে বুদ্ধিজীবী অপহরণ ও হত্যাকান্ড দ্রুত ঘটানো হয়। ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার গভর্নর হাউসে বোমাবর্ষণের পর ডা. মল্লিক মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর পাকবাহিনীর সকল আশা ধূলিসাৎ হলে ইতোমধ্যে আটককৃত কিংবা নতুন আটককৃত বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি হত্যা করা হয়। ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের মিরপুর শিয়ালবাড়ি ও মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে আরো অনেক বধ্যভূমিতে তাঁদের লাশ পাওয়া যায়। আবার কারো কারো লাশও পাওয়া যায়নি। স্বাধীনতার পর লাশের স্তুপে যাঁদের পাওয়া গিয়েছে তাঁদের সকলের হাত-পা-চোখ বাঁধা ছিল। কারো হাত নেই, কারো চোখ বা হৃৎপিন্ড নেই। এগুলো নরপিশাচদের নির্যাতনের স্বাক্ষর বহন করে।

ঙ. উল্লেখযোগ্য শহীদ বুদ্ধিজীবী

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ বাংলাদেশের সর্বত্র সংঘটিত হয়। এ যজ্ঞে শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, শিল্পী, আইনজীবী, রাজনৈতিক, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কেউ বাদ পড়েনি। যদিও স্বাধীনতার পর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে করা হয়নি। তাই তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া যায় না। তবে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে। এতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে। এতে মোট ৯৮৯ জন শিক্ষাবিদ সহ মোট ১,১০৯ জন শহীদ বুদ্ধিজীবীর পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী মোট ৬৩৯ জন প্রাথমিক, ২৭০ জন মাধ্যমিক, ৫৯ জন কলেজ, ২১ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সহ ৯৮৯ জন শিক্ষাবিদ শহীদ হন। এছাড়া ৪১ জন আইনজীবী, ৫০ জন চিকিৎসক, ১৩ জন সাংবাদিক, ৮ জন গণপরিষদ সদস্য, ১৬ জন কবি-সাহিত্যিক, প্রকৌশলী, সরকারি কর্মকর্তা শহীদ হন। যদিও পরবর্তীকালে মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানের ফলে আরো অনেক শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নাম পাওয়া গিয়েছে। 'মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী' গ্রন্থে ৬৪ জন শহীদ আইনজীবীর তালিকা রয়েছে। তাই বলা চলে তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ হলে শহীদ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ২/৩ গুণে দাঁড়াবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ শিক্ষকদের ২১ জনের মধ্যে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন শহীদ হন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব, সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ফজলুর রহমান খান, শরাফত আলী অন্যতম শহীদ বুদ্ধিজীবী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাইয়ুম, হাবীবুর রহমান, সুখরঞ্জন সমাদ্দার- এই তিনজন শহীদ হন। মানব দরদী চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আলিম চৌধুরী, শামসুদ্দীন, গোলাম মোর্তজা, জিয়াউর রহমানকেও

ঘাতকরা রেহাই দেয়নি। জনগণের পক্ষে লেখার কারণে হত্যা করে সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, নিজামুদ্দিন আহমদ, গোলাম মোস্তফা, নাজমুল হক, শহীদ সাবেরকে। হত্যা করে আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নাজমুল হক সরকার, আবদুল জব্বার, আমিন উদ্দিনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার অপরাধে প্রাণ দেন প্রকৌশলী সামসুদ্দিন, নজরুল ইসলাম, সেকান্দার হায়াত চৌধুরী, চলচ্চিত্র ও গানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালনকারী জহির রায়হান, আলতাফ মাহমুদ, কিংবা সাহিত্যিক ইন্দু সাহা, সেলিনা পারভীন, মেহেরুন্নেসা বাদ পড়েনি হায়েনাদের বুলেট থেকে।

চ. বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডে দেশে প্রতিক্রিয়া

সকল দিক থেকে বাংলাদেশের মস্তিষ্ক ধ্বংস করাই ছিলো পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর উদ্দেশ্য। স্বাধীন বাংলাদেশ যাতে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেই লক্ষকে সামনে রেখে বুদ্ধিজীবী নিধন করা হয়। পাকিস্তানিদের এ উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সফল হয়। বিভিন্ন পেশার লোকদের বেছে বেছে মেরে ফেলায় বাঙালি জাতি সাময়িকভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংকটের সম্মুখীন হয়। জহির রায়হানের মতো কথা সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশার মতো সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো প্রাজ্ঞ আইনজীবী অথবা আলিম চৌধুরী ও ফজলে রাব্বীর মতো চিকিৎসক থাকলে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর আরো উপকৃত হতো। গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মতো মানবতাবাদী, আলতাফ মাহমুদের মতো সুরকার ও শিল্পী, নিজামুদ্দিন, শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো সাংবাদিক একদিনে গড়ে ওঠেন না। এঁদের মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি বাঙালি জাতিকে বহন করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানি হানাদারদের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সফল হয়নি। অমর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের উপদেশ ও সহযোগিতায় দেশ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতা সংগ্রামে গুটি কয়েক সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবী ছাড়া বড় অংশই সমাজ-জনতার অগ্রবর্তী অংশ হিসাবে কাজ করেছে। পাকিস্তানের ব্যর্থতার লক্ষণ প্রথমে তাঁদের কাছে ধরা পড়েছে। তাঁরাই বুঝিয়েছেন ভাষার ওপর আক্রমণের অর্থ কি? অর্থনীতির গতি কোন দিকে? সেই জ্ঞানকে তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, বাকি কাজটি জনগণ করেছে। তাঁরা পাকিস্তানিদের পরাভূত করে দেশকে স্বাধীন করেছেন। অবশ্য এর বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালি আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন। শহীদ হয়েছেন বহু বুদ্ধিজীবী। বাংলাদেশকে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে একটি দুর্বল দেশে পরিণত করার জন্যই বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড চালানো হয়। শহীদ বুদ্ধিজীবীরা বেঁচে থাকলে দেশ ও জাতির জন্য আরো অবদান রাখতে পারতেন। জাতিকে সমৃদ্ধ করতে পারতেন তাঁদের প্রতিভার পরশে। অবশ্য তাদের শিক্ষা ও দেশপ্রেমের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ভবিষ্যতে অগ্রগতির সোপানে আরোহণ করতে পারবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। তথ্য বেতার মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৭২।

২। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী', *দৈনিক ইত্তেফাক*, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৯১।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মুক্তিযুদ্ধ চালাকালে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা কলকাতায় যে সংগঠন গড়ে তোলেন তার নাম-

(ক) বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (খ) বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম পরিষদ

(গ) বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি (ঘ) বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী সমিতি।

২। বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় কলকাতায় গড়ে ওঠা বাঙালিদের বেতার মাধ্যমের নাম-

(ক) স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (খ) বাংলাদেশ বেতার

(গ) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (ঘ) আকাশবাণী কলকাতা।

৩। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরিকল্পনার নাম-

(ক) অপারেশন জ্যাকপট (খ) অপারেশন সার্চলাইট

(গ) অপারেশন এন্টারপ্রাইজ (ঘ) অপারেশন এঞ্জেল।

৪। ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের প্রধান দু'টি বধ্যভূমির নাম-

(ক) রমনা-রেসকোর্স (খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও তৎকালীন ইকবাল হল

(গ) পিলখানা ও সেনানিবাস (ঘ) শিয়ালবাড়ি ও রায়ের বাজার।

৫। মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শহীদ হন-

(ক) ১৭ জন (খ) ১৯ জন

(গ) ২১ জন (ঘ) ১৫ জন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। সাধারণত কাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয় লিখুন।

২। মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের পেছনে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের কি উদ্দেশ্য তা চিহ্নিত করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের কারণ, পর্যায় এবং কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবীর নাম উল্লেখ করুন। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের ফলে দেশে প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।

পাঠ-৮

পাকিস্ত ানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন ও বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *চূড়ান্ত বিজয়ের (১৬ ডিসেম্বর) বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *আত্মসমর্পনের দলিল বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *পাকবাহিনীর পরাজয় ও বাঙালির জয়ের কারণ নির্ণয় করতে পারবেন।*

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর নির্বিচারে গণহত্যার যে সূচনা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী করেছিল ১৬ ডিসেম্বর ২৭৬ দিন পর তাদের আত্মসমর্পনের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই পরাজয়ের মাধ্যমে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র দ্বিজাতিতত্ত্বের ফসল পাকিস্তানের সমাপ্তি ঘটলো, বিজয়ী বাঙালি জাতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন দেশের জন্ম দিল। শুরু হল নতুন জাতি ও নতুন দেশের নবযাত্রা।

ক. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পনের প্রেক্ষাপট

১. গেরিলা যুদ্ধের ভয়াবহতা ও পাকবাহিনীর বিপর্যয়: ২৬ মার্চ থেকে বাঙালি যুবক, তরুণ, সেনাবাহিনী ও পুলিশের অপরিকল্পিত প্রতিরোধ জুন মাস থেকে সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধের ফলে সুসংগঠিত হয়। ভারত থেকে আগত ও স্থানীয় ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের ওপর আক্রমণ চালালে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। নভেম্বর থেকে স্থল যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিপর্যয় চূড়ান্ত হয়। ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মুক্তিবাহিনী অনেক এলাকা শত্রুমুক্ত করে। অক্টোবরের শেষ নাগাদ মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকবাহিনীর ২৩৭ জন অফিসার, ১৩৬ জন জেসিও এবং অন্যান্য শ্রেণীর ৩,৫৫৯ জন সৈন্য নিহত হয়। লে. জেনারেল নিয়াজির জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিক পাকবাহিনীর ব্যাপক মৃত্যু সম্পর্কে বলের, "প্রথম দিকে লাশ আমরা আকাশ পথে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়েছি। কিন্তু জুলাই-আগস্ট মাসে সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অযথা আতঙ্ক সৃষ্টির ভয়ে মৃতদের পশ্চিম পাকিস্তান পাঠানো বন্ধ করে দেয়া হয়।" ভারত সর্ব্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করলে এক সপ্তাহের বেশি পাকবাহিনী টিকে থাকতে পারেনি।

২. নৌ-কমান্ডোদের আক্রমণ ও নৌপথে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ সমস্যা: স্থল যুদ্ধে পাকবাহিনীর বিপর্যয়ের পাশাপাশি বাঙালি নৌ-কমান্ডোর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা, নদী ও সমুদ্র

বন্দরে ব্যাপক অভিযান চালায়। আগস্ট মাসে অপারেশন জ্যাকপটের আওতায় চট্টগ্রাম বন্দরে এম.ভি. হুরমুজ ও এম.ভি. আব্বাস জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। পরের মাসে নৌ-কমান্ডোরা ২০টি পাকিস্তানি জাহাজ ধ্বংস করে। গেরিলাদের আক্রমণে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিগুলো প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধে বড় ধরনের ৪৫টি অভিযানে ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হলে একদিকে পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে, অন্যদিকে বিশ্ব দরবারে মুক্তিযুদ্ধ পরিচিতি লাভ করে। এই জাহাজগুলোর বড় অংশই ছিল বিদেশী মালিকানাধীন। তাই সেপ্টেম্বর থেকে চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরে কোন বিদেশী জাহাজ আসতে রাজী হয়নি। এতে পাকবাহিনীর অস্ত্র ও রসদ সরবরাহে সংকট দেখা দেয়। সেপ্টেম্বর থেকে স্থল ও নৌপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম যোগাযোগ হয়ে দাঁড়ায় বিমান।

৩. যুক্ত কমান্ড গঠন ও পাকবাহিনীর পশ্চাদাপসরণ: মূলত মধ্য নভেম্বর থেকে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবেশ করতে থাকে। ১৩ নভেম্বর ট্যাংক সহ দুই ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য যশোরে ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৯ নভেম্বর পাকবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে আকাশ অভিযান পরিচালনা করলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ২১ নভেম্বরও পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং ৩ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধের আগ পর্যন্ত আর আক্রমণের সাহস পায়নি পাকবাহিনী। যশোরে ভারতীয় বাহিনীর এই সাফল্য তাদের অন্যান্য এলাকায় সরাসরি প্রবেশে অনুপ্রাণিত করে। তবে এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আরো সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যুক্ত কমান্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। লে.জে. জগজিৎ সিং অরোরার অধিনায়কত্বে বাংলাদেশের রণাঙ্গনকে ৪টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। দক্ষিণ সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল খুলনা বিভাগ ও ফরিদপুর জেলা, ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর ৮ ও ৯নং সেক্টরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উত্তর সেক্টরের আওতায় ছিল বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের সব জেলা, মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ৬ ও ৭নং সেক্টরের মুক্তিবাহিনীকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মধ্য সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল ঢাকা বিভাগের জেলাসমূহ (ফরিদপুর বাদে), ১১নং সেক্টর, জেড ফোর্স এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং পূর্ব সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহ, এর অন্তর্ভুক্ত ছিল মিত্রবাহিনী ও ১,২,৩,৪ ও ৫ নং সেক্টর, এফ ও কে ফোর্স এবং জেড ফোর্সের অংশবিশেষ। স্থল বাহিনী ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ভারতীয় বিমান, নৌ ও যুদ্ধজাহাজ। যুক্ত কমান্ড গঠনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ ক্ষিপ্রতা লাভ করে। যুক্ত কমান্ড গঠনের ১ দিন পর ২৩ নভেম্বরেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন, "পাকিস্তান বৈদেশিক আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে এবং দেশে জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে।" সেদিনই তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের এক জরুরি বার্তায় উপমহাদেশ পরিস্থিতি অবগত করেন। ২৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যেকোন সময় বড় ধরনের যুদ্ধের ইঙ্গিত দেন। এর ফলে দেখা যায় যে, ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধের আগেই দু'দেশের মধ্যে কার্যত যুদ্ধ শুরু হয়। এভাবে যুক্ত কমান্ড গঠন ইয়াহিয়া খানকে ভাবিয়ে তোলে। ১৬ ডিসেম্বর এই যুক্ত বাহিনীর কাছেই পাকবাহিনী আত্মসমর্পন করে।

৪. বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সফল কূটনৈতিক উদ্যোগ: বাংলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবগত করতে বিভিন্ন মিশন প্রেরণ করে। ১৮ এপ্রিল কলকাতাস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ভারতের বাইরে ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় শহরের রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিল করে। ১ আগস্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারের জনসভায় প্রায় চল্লিশ হাজার লোক সমবেত হয়। আগস্টের শেষদিকে ব্রিটেনে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপিত হয়। এরপর ভারত ছাড়া ৪টি মিশনসহ ১১টি প্রতিনিধিত্বকারী দপ্তর বাইরে

স্থাপিত হয়। অক্টোবর মাসে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্ব ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সমর্থনসূচক বিবৃতি আদায়ে সক্ষম হন। জাতিসংঘের ৪৭টি সদস্য দেশ বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখার ফলে ৮ নভেম্বর মার্কিন সরকার পাকিস্তানের প্রতি অর্থ নিষেধাজ্ঞা বিল পাশ করে। এরপর জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে অনেক দেশ সমর্থন দেয়। অন্যদিকে ভারত সরকার মে মাস থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। মে মাসে বিশ্বশান্তি পরিষদ, সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনালে প্রতিনিধি প্রেরণ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজধানীতে ভারতের সংসদ সদসদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়। বিদেশী মন্ত্রী শরণ সিং এ মাসে মস্কো, বন, প্যারিস, ওয়াশিংটন এবং লন্ডন যান। জুন মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়, ফখরুদ্দিন, শাহনাওয়াজ ব্যাংকক ও আরব বিশ্ব সফর করেন। এসব সফরের সাফল্য জুন-জুলাই মাসে বিশ্ব ব্যাংক, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, যুক্তরাজ্য পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ রাখতে রাজি হয়। পরের মাসেই ইয়াহিয়া খান কর্তৃক মুজিবের ফাঁসির ঘোষণার প্রতিবাদে ভারত বিশ্ব জনমত গড়ে তোলে। ভারতীয় পার্লামেন্টের ৫০০ সদস্য মুজিবের প্রাণ রক্ষার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবকে আবেদন জানান। ১১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে মুজিবের প্রাণরক্ষার জন্য এগিয়ে আসার আবেদন জানান। এ তৎপরতার ফল হিসেবে মহাসচিব মুজিবের ফাঁসি বন্ধ রাখার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে আহ্বান জানান। এ মাসেই ৪ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা সফর করেন। এসব তৎপরতার ফলে অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ সমস্যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মস্কো আগের চেয়ে বেশি বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এ মাসেই ইন্দিরা গান্ধী তিন সপ্তাহের জন্য পশ্চিমের ছয়টি দেশ যেমন- বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি সফর করেন। ইন্দিরার এই সফরের পর দেশে ফিরেই ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধের সূচনা করে। এভাবে বিভিন্ন দেশে সফল কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে পাকিস্তান অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নভেম্বরের শেষ নাগাদ পাকিস্তানের পরাজয় এড়াতে মহাসচিবকে দেয়া এক পত্রে পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগের আবেদন জানান। এরপর পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে যুদ্ধবিরতির লক্ষে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়।

৫. ভারতের সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানঃ পাকিস্তানি বিমান বাহিনী অতর্কিতে ৩ ডিসেম্বর বিভিন্ন ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে শুরু হয় সর্ব্বক যুদ্ধ। যুক্ত কমান্ড সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশ সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে। পাশাপাশি চালানো হলো বিমান হামলা। ঐদিনই পাকবাহিনীর ৩টি মিরেজ, ২টি এফ-১০৪ স্টাফ ফাইটার সহ ৩৩টি পাকিস্তানি বিমান ভূপাতিত হলো। পূর্ব সীমান্তে কামালপুর ঘাঁটির পতন ছাড়াও চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের ওপর মিত্রবাহিনীর নৌ-বহর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধের প্রথম থেকে যুক্তবাহিনীর লক্ষ ছিল ঢাকা দখল করে পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করা। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও দর্শনা, ঠাকুরগাঁও, কামালপুর, কুলাউড়া, গাজীপুর ও চৌদ্দগ্রামের পতন ঘটে। পাকবাহিনী বাংলাদেশের ভেতরে বিভিন্ন অবস্থান থেকে সেনানিবাস ও পাকঘাঁটিগুলোতে আশ্রয় নেয়। ৫-৬ ডিসেম্বর ফেনী, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া যুক্তবাহিনীর দখলে আসে। কুমিল্লা ও ফেনীতে ৭০০ পাক সেনা নিহত হয়। ৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী লালমনিরহাট মুক্ত করে। ভারতীয় নৌবাহিনী খুলনা, চালনা, মঙ্গলা ও চট্টগ্রাম বন্দরে মারাত্মক আক্রমণ চালায়। ঐদিন ভারত সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এরফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। পরের দিন যশোর বিমান বন্দরের পতনের পর পর যুক্তবাহিনী শহরে প্রবেশ করে। ৮-৯ ডিসেম্বর কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া,

নোয়াখালী শহর ভারতীয় বাহিনীর দখলে আসে। যশোর, চাঁদপুর, সিলেট, দাউদকান্দি ও ফেনীর বিস্তীর্ণ এলাকা যুক্তবাহিনীর অধিকারে আসে। ঐদিন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল (বর্তমান হোটেল শেরাটন) নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে কূটনৈতিক ও বিদেশী নাগরিকদের আশ্রয় দেয়া হয়। ঐদিন বিশেষ বিমানযোগে ঢাকা থেকে বৃটিশ ও অন্যান্য বিদেশী নাগরিক অপসারণ করা হয়। ১১-১২ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ, হিলি, কুষ্টিয়া, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ মুক্ত হলে যুক্তবাহিনী ঢাকা দখলকে প্রাধান্য দেয়। ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় সামরিক অবস্থানের ওপর বিমান হামলা অব্যাহত থাকে। বিজয় নিশ্চিত জেনেও যুক্তবাহিনী জান মালের ক্ষতি কমানোর জন্য যথাশীঘ্র ঢাকা জয়ের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। চারদিক থেকে ঢাকা অভিমুখে রওনা হয় যুক্তবাহিনী- একটি দল নরসিংদী দিয়ে, দু'টি দল ডেমরা ও বাসাবো দিয়ে, অন্য দল টাঙ্গাইল দিয়ে ঢাকা আসে। দেশের অন্যত্র পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ শুরু হয়ে যায়। ঐদিনই বেসামরিক গভর্নর ডা. মালিক ইয়াহিয়াকে পাঠানো জরুরি বার্তায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। ভারতীয় বাহিনী পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পনের পরামর্শ দেয়। যদিও ইয়াহিয়া খান যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন, কিন্তু ঢাকায় অবস্থানরত জেনারেলরা যুদ্ধবিরতির প্রস্তুতি নেন। ঐদিনই সব বাধা ডিঙ্গিয়ে ঢাকার চারদিকে যুক্তবাহিনী নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী গড়ে তোলে। ভীতসন্ত্রস্ত ডা. মালিক পদত্যাগ করে তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে নিরপেক্ষ এলাকায় আশ্রয় নেন। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা ছাড়া বড় শহর ও সেনানিবাসে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ঢাকার আত্মসমর্পণ সময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়। পরের দিন জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পনের জন্য জেনারেল মানেক শ'-এর কাছে বার্তা পাঠান। ঐদিন রাতেই নিয়াজি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। মিরপুরে অবস্থানরত মিত্রবাহিনীর বিভাগীয় কমান্ডার জেনারেল নাগরাকে নির্দেশ দেয়া হয় যুদ্ধ বন্ধ রাখার। বিকেলেই যৌথ বাহিনী সাভার প্রবেশ করে। স্থির হয় পরের দিন সকাল ৯টায় (১৬ ডিসেম্বর) পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ৪,১০২ জন পাক সেনা ও ৪,০৬৬ জন প্যারামিলিটারি সৈন্য ধরা পড়ে। এভাবে সামরিক বিপর্যয়, বেসামরিক পাকিস্তানিদের আত্মসর্মপনের চাপ এবং দূতাবাসগুলোর চাপে আত্মসমর্পণ ছাড়া নিয়াজির কোন উপায় ছিল না।

৬. জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি ও পাল্টা প্রস্তাবঃ ৩ ডিসেম্বর সর্ব্বক যুদ্ধ শুরু হলে পরের দিনই নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে এ প্রসঙ্গটি আলোচনা শুরু হয়। ঐদিনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য একের পর এক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পেশ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ৪, ৫ ডিসেম্বর এ প্রস্তাবে ভেটো দিলে ৭ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে তা স্থানান্তরিত হয়। ঐদিন ১৩টি সদস্য রাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির পক্ষে একটি প্রস্তাব দিলে ১৩১টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১০৪টি রাষ্ট্র তা সমর্থন করে। ভারত ও পাকিস্তানকে এ প্রস্তাব পাঠালে ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় ১৩ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করলে রুশ ভেটোর কারণে তা বাতিল হয়। জাতিসংঘে যখন প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব, ভেটো চলছিল তখন বাংলাদেশ রণাঙ্গনে চলছিল তুমুল যুদ্ধ এবং পাকিস্তানি বাহিনী চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ঢাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। জাতিসংঘ কোন রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্তান জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যা সমাধান তার অনুকূলে পাওয়ার আশা ত্যাগ করে। অতএব, আত্মসমর্পণকেই একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেয়। পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।

খ. বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় ও পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পন (১৬ ডিসেম্বর)

ন'মাসের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি জাতির জীবনে ১৬ ডিসেম্বর নতুন প্রভাত এলো। নিয়াজির নির্দেশে ভোর পাঁচটা থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। যৌথ বাহিনীর বিভাগীয় কমান্ডার জেনারেল নাগরা অগ্রবর্তী দলের প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই বৈঠকে আত্মসমর্পন ৬ ঘন্টা পিছিয়ে দেয়া হয়। বেলা ১টা নাগাদ ঢাকা এসে পৌঁছেন যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরা ও চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপপ্রধান এয়ার কমোডোর এ.কে. খন্দকার। বেতারে আত্মসমর্পনের খবর প্রচারিত হওয়ায় অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর হাজার হাজার লোক 'জয়বাংলা' শ্লোগান দিয়ে হাজির হলো রেসকোর্স ময়দানে। পাকিস্তানি বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল হাজির করা হলো বিজয়ীকে গার্ড অব অনার দেয়ার জন্য। ঐদিন পৌনে ৫টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এরপর আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য জেনারেল নিয়াজি তার কোমরের বেল্ট থেকে সুদৃশ্য রিভলবার ও ইউনিফর্মের কাঁধ থেকে লে. জেনারেল ব্যাজ খুলে লে. জেনারেল অরোরার হাতে দেন। পরাজিত পাকবাহিনীর সকল সদস্য ব্যাজ খুলে তাকে অনুসরণ করে। শুরু হলো নতুন দেশের যাত্রা। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোট ৯১,৬৩৪ জন আত্মসমর্পণ করে। এদের মধ্যে ৭৪,৮৫৬ জন সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য ও তাদের পোষ্য এবং ১৬,৫৪৫ জন বেসামরিক সদস্য ও তাদের পোষ্য।

গ. আত্মসমর্পনের দলিল

"পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় এবং বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানের সকল সশস্ত্রবাহিনীর আত্মসমর্পনে স্বীকৃত হচ্ছেন। এই আত্মসমর্পন পাকিস্তানের সকল সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী এবং আধা-সামরিক ও বেসামরিক সশস্ত্রবাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব বাহিনীর সকলেই– যারা যেখানে আছে, সেখানকার নিকটস্থ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কর্তৃত্বাধীন নিয়মিত সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন ও সকল অস্ত্র সমর্পন করবে।"

"এই দলিল স্বাক্ষরের সময় থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার নির্দেশের অধীনস্ত বলে বিবেচিত হবে। কোন প্রকার অবাধ্যতা আত্মসমর্পনের শর্ত ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং যুদ্ধের স্বীকৃত ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। যদি আত্মসমর্পনের কোন শর্তের ব্যাখ্যা বা অর্থ সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।"

"লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এই আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, আত্মসমর্পনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি জেনেভা কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী একজন সৈনিকের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং আত্মসমর্পনকারী সকল সামরিক ও আধা-সামরিক ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থার অঙ্গীকার প্রদান করছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনস্ত সেনাবাহিনী সকল বিদেশী নাগরিক, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যক্তিদের নিরাপত্তা প্রদান করবে।

জগজিৎ সিং অরোরা **আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি**

লেফটেন্যান্ট জেনারেল
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ
ভারত-বাংলাদেশ বাহিনী পূর্ব রণাঙ্গন
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

লেফটেন্যান্ট জেনারেল
সামরিক আইন প্রশাসক
জোন-টি এবং কমান্ডার
পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড (পাকিস্তান)
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

ঘ. পাকবাহিনীর পরাজয় ও বাঙালির জয়ের কারণ

পাকবাহিনীর পরাজয়ের বেশ কিছু কারণ ছিল–

১. ভৌগোলিক কারণ: পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব ১৬০০ কিলোমিটার। তিনদিকে শত্রুভাবাপন্ন ভারতীয় রাষ্ট্রসীমা দ্বারা পাকিস্তান পরিবেষ্টিত। পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর যেখানে সহজেই ভারতীয় নৌবাহিনী প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। শুধুমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বার্মার দিকে একটি ছোট্ট মুখ খোলা আছে। এই অগ্রমুখ বরাবর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। গভীর জঙ্গলে ঘেরা এই পার্বত্য এলাকাটিতে রাজত্ব করে বন্যপশু এবং মিজোরা। এই অঞ্চলে কোন সামরিক অপারেশন সম্ভব নয়। উপরন্তু রয়েছে বিপুল জলপথ। এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবন। মে-সেপ্টেম্বর সাধারণ বর্ষাকাল। মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম চলাচল প্রায় অসম্ভব। ফলে এসময় গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের নৈতিক মনোবল ও কায়িক শক্তির ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। অন্যদিকে ভারত এ সময় বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে নতুন আট ডিভিশনের এক সেনা সমাবেশ ঘটায়। ভারতীয় বাহিনীর নিজ ভূখন্ড থেকে অভিযান করে আবার ফিরে যাওয়ার সুবিধা ছিল। এ অবস্থায় ভারত ও পাকিস্তান উভয় পক্ষ মধ্য নভেম্বর শীত মৌসুমকে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য বেছে নেয়। বস্তুতপক্ষে, ১৩ নভেম্বর পশ্চিম বাংলার বায়রা এলাকা থেকে ট্যাঙ্ক সহ ভারতীয় সৈন্য পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে। অন্যদিকে ১৯, ২১ নভেম্বর পাকবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ব্যর্থ হয়। কার্যত এ সময় সীমান্তবর্তী সকল অভিযানে পাকিস্তান ব্যাপক ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। সব দিক দিয়ে শত্রু পরিবেষ্টিত এই ধরনের ভৌগোলিক অবস্থায় পরাজিত সৈন্যদের পালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব ছিল।

২. ভারতীয় সৈন্যদের বিপুল সংখ্যা ও উন্নত রণকৌশল: নভেম্বরে পাকিস্তান তার সশস্ত্রবাহিনীর সশস্ত্র শক্তি বিমান, নৌ, পদাতিক শক্তিমত্তা নিয়োগ করে পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে। পাকবাহিনীর পূর্ব রণাঙ্গনে ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্যের বিপরীতে ভারত নিয়োজিত করে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার সৈন্য। এছাড়া ছিল ১ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও এর চেয়েও বেশি স্বেচ্ছাসেবক। ভারতীয় ৮ ডিভিশন, তিন ব্রিগেডের বিপরীতে পাকিস্তানের ছিল তিন ডিভিশন ও ১টি ব্রিগেড। বিমান শক্তিতে দেখা যায় ভারতীয় দশ স্কোয়াড্রনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গে ছিল এক স্কোয়াড্রন। ভারত পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনের জন্য একটি শক্তিশালী বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ টাস্কফোর্স সৃষ্টি করে। অথচ আগস্ট মাস থেকে নৌ-কমান্ডোদের অভিযানের জবাব দেয়ার মতো পাকিস্তানের কার্যত কোন নৌশক্তিই ছিল না। শক্তিশালী ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে তাই বেশিক্ষণ পাকিস্তান টিকে থাকতে পারেনি। মাত্র তের দিনের মধ্যেই পর্যুদস্ত পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এ সময় ভারত

পাকিস্তানের ১৭৫টি পাক ট্যাঙ্ক, ৮৩টি বিমান ধ্বংস করে। ভারতের যুদ্ধ কৌশলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোভিয়েত পরামর্শকের পরামর্শ। যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী শৃঙ্খলা প্রদর্শন করে। সহযোগিতা পায় প্রতিটি বাঙালির। বিজয়ের প্রতি তাদের আস্থা জয় নিশ্চিত করে। অন্যদিকে দুর্বল সামরিক শক্তি, যুদ্ধ কৌশল এবং মার্কিন সপ্তম নৌবহরের প্রতি নির্ভরশীলতা এবং তা না আসায় পাকিস্তান বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায়।

৩. মনস্তাত্ত্বিক কারণ: হানাদার বাহিনী দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় এবং পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকায় নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলে। মুক্তিবাহিনীর কোন বন্দি শিবির না থাকায় ধৃত পাকিস্তানি সৈন্যদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা লোমহর্ষক কাহিনী সৈন্যদের শিবিরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরকম অনেক নজির আছে যেখানে আত্মসমর্পনের প্রাক্কালে পাক সৈন্যরা চিৎকার করে বলেছে, "আত্মসমর্পণ করব, তবে মুক্তিবাহিনীর কাছে নয় ভারতীয় বাহিনীর কাছে।" সিদ্দিক সালিক সৈনিকদের দুর্বল মনোবল সম্পর্কে বলেন, তাদের প্রশিক্ষণের সময়, সমর উপকরণ ও নৈতিক মনোবল নিম্নস্তরের। তারা দীর্ঘ আট মাস যাবৎ নিয়োজিত। কিন্তু পরিস্থিতির কোন অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছে না। কয়েক মাস ধরে তারা বিশ্রাম পায়নি। তাদের অনেকেরই বুট আছে, কিন্তু মোজা বা শোয়ার চৌকি নেই। সবচেয়ে খারাপটি হলো, অপারেশনে যাবার ব্যাপারে তাদের অনেকেরই মনের দিক থেকে সায় ছিল না।

৪. অর্থ সংকট: সামরিক উপকরণ ও অর্থ সংকট পাকবাহিনীর পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রির ওপর মার্কিন কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা, যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স ও কানাডার অর্থ সাহায্য বন্ধের ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ থাকে। বিশ্ব ব্যাংকের জুন মাস থেকে অনুদান স্থগিত, যুদ্ধের কারণে রপ্তানি হ্রাস- সব মিলিয়ে নগদ অর্থে বৈদেশিক মুদ্রায় অস্ত্র কেনার পথ বন্ধ থাকে। এরপর পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কয়েকটি আরব দেশের গোপন সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হলেও তা ছিল অপ্রতুল। ডিসেম্বরে চূড়ান্ত যুদ্ধে এসব উৎস থেকে যে বিমান সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল তা পশ্চিম রণাঙ্গনে নিয়োজিত করায় পূর্ব রণাঙ্গনে যৌথবাহিনী সহজে জয় লাভ করে।

৫. পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যা ও নারী নির্যাতন: ২৫ মার্চ '৭১ মধ্যরাত থেকে সেনা, রাইফেলস, পুলিশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ ব্যাপক গণহত্যার সূচনা ঘটায়। এই হত্যাকান্ড পরবর্তী দিনগুলোতে আরো ভয়াবহ রূপলাভ করে। এই পর্যায়ে ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত রূপরেখা অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধের সূচনা হয়। পাশাপাশি উল্লেখিত বাহিনীগুলোর বাঙালি সদস্যরাও প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। এর সঙ্গে শুরু হয় ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ। ফলে সম্মিলিতভাবে বাঙালির প্রতিরোধের সূচনা ঘটে। গণহত্যার এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ফলেই বাঙালি জাতির একাংশ এর আগে পর্যন্ত স্বাধীনতার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত থাকলেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বাহিনী গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত রূপ লাভ করে। এরপরে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা যত বাড়তে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ স্পৃহাও বহুগুণ বেড়ে যায়। যার চূড়ান্তরূপ লাভ করে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন।

৬. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন ও এর যুদ্ধ পরিচালনা: মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই বাংলাদেশের সরকার গঠন করা হয়। উক্ত সরকার গঠনের পূর্বে স্বাধীনতার ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সরকারিভাবে এই ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, উপযোগিতা এবং ভবিষ্যত রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এই সরকার ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামের আমবাগানে শপথ গ্রহণ করে। অতপর এই স্থানের নামকরণ

হয় 'মুজিবনগর'। সরকারের নামকরণ করা হয় 'মুজিবনগর সরকার'। আধুনিক বিশ্বে প্রবাসী সরকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। মুজিবনগর সরকার কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে তার সদর দপ্তর স্থাপন করে প্রবাসী সরকারের কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। এই সরকার ছিল সুসংগঠিত এবং এর কর্মকান্ড ছিল ব্যাপক। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদান, ১ কোটি শরণার্থীর আশ্রয় ও ত্রাণ ব্যবস্থায় সহযোগিতা, মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলাদের প্রশিক্ষণ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। একটি সরকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ সহ একটি প্রশাসনিক কর্মকান্ড প্রয়োজন হয় যা মুজিবনগর সরকারের ছিল। এই সরকার ১২টি মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১১টি সেক্টর এবং ৩টি ব্রিগেড গঠন করে। এছাড়াও আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামো এবং উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। বহির্বিশ্বে ব্যাপক তৎপরতার ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক সহানুভূতি জাগতে থাকে। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ গোড়ার দিকে বহির্বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হলেও অচিরেই এটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের শেষদিকে জাতিসংঘ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে।

৭. বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের সমর্থনঃ মুক্তিযুদ্ধ সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করে। যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও সে দেশের জনগণ, প্রশাসন, রাজনীতিবিদ, শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেন। ১ এপ্রিল ১৯৭১ দু'জন সিনেটর যথাক্রমে ম্যাসাচুসেটসের এডওয়ার্ড কেনেডি এবং ওকলাহোমার ফ্রেড হারিস বাংলাদেশের সমস্যার ওপর বক্তব্য রাখেন। তারা রক্তপাত বন্ধ এবং দুস্থদের সাহায্যের আবেদন জানান। ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজে পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে ইয়াহিয়াকে গণহত্যা বন্ধ করতে আহ্বান জানানো হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর, স্টোনহাউজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। জর্জ হ্যারিসনের 'এ কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভারত, ফ্রান্স সহ বিশ্বের বিশাল অংশে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জনমত গড়ে ওঠে। সেপ্টেম্বর ১৯৭১ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সম্মেলনে ৩৩টি দেশের শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। এই সম্মেলনে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চিত্রটি উপলব্ধি করেন এবং স্ব স্ব দেশে ফিরে গিয়ে গণমাধ্যমে তা তুলে ধরেন। কোন কোন প্রতিনিধি নিজ নিজ দেশের সরকারের ওপর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। ফলে সেপ্টেম্বর '৭১-এর পর অনেক দেশেরই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এই সম্মেলনে ফরাসি সাহিত্যিক আদ্রে মারলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারত বিপুল শরণার্থীদের আশ্রয়দান, তাদের ভারণপোষণ, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ, বহির্বিশ্ব এবং জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

৮. পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলা ও রাজনীতিবিদদের দ্বন্দ্বঃ মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানের জেনারেল ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে বাঙালির বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি হলেও ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বের শেষ ছিল না। রাজনীতিবিদদের মধ্যে দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন আওয়ামী লীগের যেসব সদস্যরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে তখন জাতীয় পরিষদের ৭৮ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১৭১ জন সদস্য পদে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে পিপল্‌স পার্টি, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, পিডিপি'র মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পিপল্‌স পার্টি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে একটিও আসন না পেলেও বাটোয়ারার রাজনীতির কারণে ১২টি আসন দাবি করে। এসময় পিপল্‌স পার্টির সঙ্গে জামায়াতের প্রথম ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলে। অবশ্য শেষপর্যন্ত পিপল্‌স পার্টির জয় হয় এবং ডিসেম্বরে

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেষ রক্ষা হিসেবে নুরুল আমীনকে প্রধানমন্ত্রী করে যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাতে ভুট্টো সহকারী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এ সময় প্রশাসনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একদিকে ইয়াহিয়া, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল হামিদের দল, অন্যদিকে ভুট্টোর বেসামরিক মন্ত্রীদের গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে মতবিরোধে পিন্ডি কর্তৃপক্ষ বেশ অগোছালো হয়ে পড়ে। পীরজাদার মতো একজন অদক্ষ জেনারেল স্টাফের কর্তৃত্বে সেনাবাহিনী ছেড়ে দেয়ায় ভয়াবহ রূপ নেয়। ইয়াহিয়া তার পছন্দমতো দুই জেনারেলকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করেন যার একজন টিক্কা খান। 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে পরিচিত এই জেনারেলের বাংলাদেশেও নৃশংসতার পরিচয় ছিল পুরো মাত্রায়। অপর জেনারেল নিয়াজি 'দি টাইগার' নামে পরিচিত হলেও যুদ্ধ পরিচালনায় দক্ষতার চেয়ে নৃশংসতা ও স্থূল বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। টিক্কা খানের পরামর্শদাতা জেনারেল রাও ফরমান আলী ও মেজর সিদ্দিক সালিক নিয়াজির রণকৌশল ও রণদক্ষতার সমালোচনা করেন। রাও ফরমান আলীর ভাষায় 'নিয়াজি একটি ষাঁড়ের মতো প্রতিটি হামলার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছেন এবং এভাবে তার সকল বাহিনীকে অগ্রবর্তী অবস্থানে ঠেলে দিয়েছেন। ফলে ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর যখন সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়, তার আগেই তার বাহিনী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।' এভাবে মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে সামরিক-বেসামরিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশ ইস্যুতে সামরিক মতৈক্য হলেও ডিসেম্বরে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রায় নিশ্চিত তখন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকট রূপ নেয়। যা তাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে।

সর্বোপরি, এ যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় এবং বাঙালির বিজয়ের আরেকটি কারণ উল্লেখ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি গণযুদ্ধ। এ যুদ্ধে কতিপয় ব্যক্তি এবং গোষ্ঠি ছাড়া প্রায় সকলেই ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছিল। কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, রশদ সরবরাহ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। এমনকি মহিলা, শিশু-কিশোররা এতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নেয়। বাঙালি জাতি দুর্জয় দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, একাগ্রতার মাধ্যমে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করে। অন্যদিকে পাকিস্তানি বাহিনী ধ্বংসযজ্ঞ, নৃশংসতা, পাশবিকতাকে আশ্রয় করে লক্ষহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাদের সহযোগী বাহিনী বিশেষ করে রাজাকার, আলবদর, শান্তি কমিটি, আলশামস-এ যোগ দেয় বেকার যুবক, '৭০-এর নির্বাচনে পরাজিত রাজনীতিক কর্মী, অবাঙালি বিহারি সম্প্রদায়। মুখে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার কথা বললেও তাদের মূল লক্ষ ছিল লুটপাট, নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন। এই নৈতিকতা বর্জিত, দেশপ্রেম বর্জিত বাহিনীর দ্বারা যুদ্ধে জয় ছিল অসম্ভব। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির বিপরীতে এদের স্বল্প সংখ্যাও পরাজয়ের কারণ। পাকবাহিনীর নৈতিকতা ও দুর্নীতি পরায়ণতার জন্য আটক পাক যুদ্ধবন্দিরা পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার পর এদের বড় অংশকেই চাকরিচ্যুত করা হয়।

সারসংক্ষেপ

ইয়াহিয়া ও নিয়াজির একজন পাকিস্তানি জীবিত থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার হুংকার সত্ত্বেও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে হুংকার থেমে যায়। ঐদিন ভারত একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার ঘন্টাখানেক পরই নিয়াজি যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। আত্মসমর্পনের মাধ্যমে স্বীকার করে নেন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাঙালি জাতিকে, যে জাতিকে নির্মুল করার জন্য পাকিস্তানি জেনারেল ও তার সহযোগীরা গণহত্যা চালিয়েছে ন'মাস।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, চতুর্দশ খন্ড, ঢাকাঃ তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮২।
২। অভীক সরকার, *বাংলা নামে দেশ*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২, ৩য় সংস্করণ।
৩। মাসুদুল হক, *বাঙালি হত্যা এবং পাকিস্তানের ভাঙ্গন*, ঢাকা, সূচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৯৭।
৪। সিদ্দিক সালিক (ভাষান্তরঃ মাসুদুল হক), *নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল*, ঢাকা, নভেল পাবলিশার্স, ১৯৮৮।
৫। রাও ফরমান আলী খান (শাহ আহমেদ রেজা অনুদিত), *বাংলাদেশের জন্ম*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৬।
৬। মাহমুদ হাসান, *দিনপঞ্জিঃ একাত্তর*, ঢাকা, পাইওনিয়ার, ১৯৯১।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশ ও ভারত যুক্ত কমান্ড গঠিত হয়–
(ক) ২১ নভেম্বর; (খ) ২৬ নভেম্বর;
(গ) ৩ ডিসেম্বর; (ঘ) ৬ ডিসেম্বর।

২। যুক্ত কমান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক ছিলেন–
(ক) লে. জেনারেল নিয়াজি; (খ) লে. জেনারেল জ্যাকব;
(গ) লে. জেনারেল অরোরা; (ঘ) মেজর হামিদ।

৩। পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন–
(ক) মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী; (খ) লে. জেনারেল আবদুল হামিদ খান;
(গ) লে. জেনারেল টিক্কা খান; (ঘ) লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি।

৪। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন–
(ক) জেনারেল ওসমানী; (খ) এয়ার কমোডোর এ.কে. খন্দকার;
(গ) কাদের সিদ্দিকী; (ঘ) মেজর হায়দার।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। বাংলাদেশ ও ভারতের সফল কূটনৈতিক উদ্যোগ কিভাবে পাকিস্তান সরকারের পরাজয়ে ভূমিকা রাখে লিখুন।
২। ৩-১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধে বিপর্যয় সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
৩। আত্মসমর্পনের দলিলের বিষয়বস্তু লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়? পাকবাহিনীর পরাজয় ও বাঙালির বিজয় আপনি কিভাবে চিহ্নিত করবেন?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরঃ

পাঠ-১: ১। (খ); ২। (গ); ৩। (ঘ)।

পাঠ-২: ১। (গ); ২। (ক); ৩। (গ); ৪। (গ); ৫। (ঘ)।

পাঠ-৩: ১। (খ); ২। (ঘ); ৩। (ক); ৪। (ক); ৫। (গ); ৬। (ক); ৭। (ঘ)।

পাঠ-৪: ১। (খ); ২। (খ); ৩। (গ); ৪। (ক); ৫। (ঘ); ৬। (খ)।

পাঠ-৫: ১। (খ); ২। (ঘ); ৩। (ক); ৪। (ক); ৫। (গ); ৬। (খ); ৭। (ঘ)।

পাঠ-৬: ১। (গ); ২। (খ); ৩। (ঘ); ৪। (খ); ৫। (খ)।

পাঠ-৭: ১। (খ); ২। (গ); ৩। (খ); ৪। (ঘ); ৫। (ক)।

পাঠ-৮: ১। (ক); ২। (গ); ৩। (ঘ); ৪। (খ)।